প্রথম অধ্যায়

জাতীয় ও বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ:

একটি সাধারণ প্রতিবেদন

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় ও বঙ্গীয় প্রেক্ষিতে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহ: একটি সাধারণ প্রতিবেদন

ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ শতকের চল্লিশের দশক একাধিক যুগান্তকারী ঘটনার চিহ্নবাহী। বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলন, মন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। আমরা এই দশকের ঘটনাপ্রবাহকে আধেয় করে লেখা কিছু উপন্যাসের আলোচনার সূত্রে বারংবার ইতিহাসের দ্বারস্থ হব। তাই এই পর্বের ইতিহাসের কিছু কথা প্রবেশক অধ্যায়টিতে উপস্থাপন করছি।

ভারতবর্ষ প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশের উপনিবেশ ছিল। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে সে সময়ে যথেচ্ছ শোষণ করেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানুষের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা অদম্য হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষ আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসেছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে । স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই। 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' গ্রন্থে আমরা পাই--

> "রাজনীতি সচেতন ভারতীয়রা এই সময়ে উত্তরোত্তর বেশি করে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অনুভব করেছিলেন। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকলে সেখানে বিভিন্ন চিন্তার প্রবাহ মিলিত হতে পারত ও সর্বগ্রাহ্য কর্মসূচি নির্ধারণ করা সম্ভব হ'ত। তাছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রকে আরো বিস্তীর্ণ করে তুলতে হলে যে জনশিক্ষার প্রচার অপরিহার্য, কোনো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারত।"[১]

এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়ে অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী এ.ও. হিউমের সহযোগিতায় বোম্বাইয়ে মিলিত হলেন ১৮৮৫ র ডিসেম্বরের শেষ দিনগুলিতে । এই নেতাদের সিদ্ধান্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেসের

প্রথম সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের উৎসাহদানের প্রধান উদ্দেশ্য 'সেফটি ভাল্‌ভের' ব্যবস্থা করা বলে অনেকে মত পোষণ করেন। এই বিক্ষুব্ধ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ যাতে নিরাপদে বহিঃপ্রকাশ হয় এবং যাতে তাঁরা বিক্ষুব্ধ কৃষকসমাজের সঙ্গে হাত মেলাবার সুযোগ না পান তাই ছিল হিউমের লক্ষ্য। অবশ্য এই মতটি একতরফা এবং ভ্রান্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন বিপান চন্দ্র এবং অমলেশ ত্রিপাঠী। তাঁদের মতে"

"জাতীয় কংগ্রেস কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা হিসেবে এ ধারণা পুরোপুরি অসম্পূর্ণ, এমনকি ভ্রান্ত। এই ব্যাপারে হিউম এর ভূমিকা কী ছিল তার সীমিত আভাস এতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে ভারতীয় নেতারা কেন এত সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার ব্যাখ্যা এতে মেলে না। তাঁরা ছিলেন এক নতুন সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি; ব্রিটিশের স্বার্থে ভারতকে যেভাবে শোষণ করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।..... তাঁরা ছিলেন খাঁটি স্বদেশপ্রেমী, বিদেশি সরকারের ক্রীড়নক নয়। তাঁদের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার আদি পর্বেই সরকারী রোষের কবলে পড়তে চাননি বলে তারা হিউমের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন।"[২]

এই নেতাদের ব্রিটিশ সরকার এবং শাসনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকেই কিছু অধিকার আদায় করে নিতে চেয়েছিল। যেমন ভারতে শিল্প স্থাপন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, করের বোঝা কমানো, কৃষকদের ওপর শোষণের মাত্রা কমানো, লবন শুল্ক কমানো ইত্যাদি। কিন্তু খুব শিগগিরই কংগ্রেসের ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে মোহভঙ্গ হল কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ দাবি করল এবং স্বদেশি বস্তু ব্যবহারের ডাক দিল। দাদাভাই নরৌজি, এস.এন. ব্যানার্জী, ফিরোজ শাহ মেহেতা এই নেতাদের মধ্যে অন্যতম। একথা অবশ্য মনে করা ঠিক নয় যে ১৮৮৫থেকে ১৯৩৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী

চেতনার প্রসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল একক বা প্রধান। অন্যান্য অসংখ্য প্রবাহ বেয়ে জাতীয় চেতনা উন্মেষ ও অভিব্যক্তি লাভ করেছিল এই যুগে। দৈনন্দিন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যম ছিল অসংখ্য আঞ্চলিক এবং প্রাদেশিক সমিতি। বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে জনসাধারণ অনেক বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করত। জাতীয় আন্দোলনের সংগঠক ও প্রচারক হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল সংবাদপত্রের ভূমিকা। এই যুগের অধিকাংশ সংবাদপত্রই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশিত হ'ত না; জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংবাদপত্রের মালিক এবং সম্পাদকের অনেক সময় অসীম আত্মত্যাগের পরিচয় দিতে হয়েছে।

অবশ্য "১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করল, যদিও সূচনায় তার প্রকৃতি ছিল সীমিত, দ্বিধাগ্রস্ত এবং মৃদু। তার ক্ষমতা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন স্তরে পৌঁছেছিলযে অবশেষে বিদেশি শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে শক্তিশালী চরমপন্থী সংগ্রামে লিপ্ত করানো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।"[৩]

আদি জাতীয়তাবাদীরা মড্‌রেট বা মধ্যপন্থী আখ্যা অর্জন করেছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির জন্য। তাঁদের আন্দোলন ছিল সতর্ক ও মন্থর; আইন বাঁচিয়ে, শৃঙ্খলা বজায় রেখে তবে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা ছিল এর লক্ষ্য। আন্দোলনের নেতাদের ধারণা ছিল যে তাঁদের প্রধান কর্তব্য জনসাধারণকে আধুনিক রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া এবং জাতীয় রাজনীতি - চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ জনমত সংগঠন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা কতকগুলি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এক হ'ল জনসভায় উচ্চাঙ্গ রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বক্তৃতা ও বিবিধ প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের দাবিকে রূপ দেওয়া, আর দ্বিতীয়, সংবাদ পত্রে

প্রতিনিয়ত সরকারের সমালোচনা করে যাওয়া। আর ছিল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এমন-কি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছেও অসংখ্য প্রার্থনাপত্র বা আবেদনপত্র পেশ করা। তথ্য ও যুক্তিতে সমৃদ্ধ এই স্মারকপত্র ও আবেদনপত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে দেখলে, সরকারের উদ্দেশ্যেই লেখা হ'ত। এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল জনসাধারণকে সচেতন ও অবহিত করে তোলা।

অর্থাৎ অনুনয় বিনয়ের রাজনীতির পথ অবলম্বন করেছিলেন সে সময়কার জাতীয়তাবাদী নেতারা। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে "সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডির ওপর নির্ভর করে থাকাই ছিল আদিপর্বের জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা। সর্বসাধারণের কাছে এ আন্দোলনের আহ্বান তখনো পৌঁছায়নি। শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মানুষ শুধু এর ডাকে তখন সাড়া দিতে শুরু করেছে। বিশেষত আন্দোলনের নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ ছিল আইনজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিক,শিক্ষক এবং মাত্র কয়েকজন ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের মধ্যে।"[৪]

প্রাথমিক পর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে সাধারণ মানুষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপর, তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ডেকে আনা যাবে না। তাঁরা বুঝতে পারেননি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুচিরস্থায়ী সংগ্রামে যে বীরত্ব, যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন তা দিতে পারে শুধু সাধারণ মানুষ। তাঁদের বরং ধারণা ছিল, বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজকে যদি একটা জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, শুধু তা হলেই দেশের সাধারণ মানুষকে চরমপন্থী সংগ্রামের পথে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাঁরা একথা বোঝেননি যে একমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। তাঁরা নিজেরা দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলে তাদের সম্পর্কে এই ছিল আদি জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ভূমিকাও ছিল তাই নিরপেক্ষ।"

কংগ্রেস জাতীয়তাবাদীরা যে তত্ত্বের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে

মূর্ত করে তুলেছিলেন সে তত্ত্ব হ'ল 'নির্গমন তত্ত্ব' বা 'ড্রেন থিয়োরি'। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতের অর্থসম্পদ ও মুলধনের একটা বড়ো অংশ বিভিন্ন পথ বেয়ে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে। এদেশে খাটানো ঋণের সুদ হিসেবে, ব্রিটিশ পুঁজির লভ্যাংশের আকার, আবার সামরিক, বেসামরিক অসংখ্য কর্মচারীর বেতন ও অবসরবৃত্তি রূপে এই নির্গমনের পথ সব সময়েই খোলা। এই নির্গমনের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে ধরা পড়েছিল ভারতে বৈদেশিক শোষণের স্বরূপ। তাই আদি জাতীয়তাবাদীরা যখন এই নির্গমনকে (drain) তাঁদের তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য করে তুললেন। তখন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূলেই আঘাত পড়ল। ঔপনিবেশিক শোষণের পদ্ধতি কী তা ও এর মাধ্যমে স্বচ্ছ হয়ে উঠল সাধারণ মানুষের কাছে।[৫]

একেবারে প্রথম দিকে কংগ্রেসের প্রতি ইংরাজ সরকারের কোনো বিরূপতা ছিল না। বরং তাঁদের আশা ছিল কংগ্রেসের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু রাজনীতি সচেতন ভারতীয় শুধু পণ্ডিত-সুলভ আলোচনায় নিজেদের ব্যস্ত রাখবেন। জাতীয় নেতাদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে দীপ্তিমান, তাঁদের আইন সভায় আসন দিয়ে বা বিচারবিভাগ বা অন্যান্য শাসন বিভাগে মোটা মাইনের চাকুরি দিয়ে নিজেদের দলে আনবার চেষ্টা করতেও সরকার কুণ্ঠিত ছিলেননা। কিন্তু ১৮৮৮ সালের পর থেকে ইংরেজ সরকারের মনোভাব বদলাতে লাগল। কংগ্রেসের বর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অবস্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে হুমকিস্বরূপ মনে হল এবং কংগ্রেসের গতিবিধিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলতে লাগল। সরকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ তৈরির জন্য সকল ধরণের মৌলবাদী শক্তিকে সাহায্য করতে লাগল এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে লাগল, এইভাবে সরকার কংগ্রেসের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে লাগল এবং ১৮৯২ সালে নতুন আইন প্রণয়ন করে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলতে লাগল। "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের

দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে প্রগতিমূলক যা কিছু ছিল তা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে হাতমেলাতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সামাজিক গোঁড়ামি বা প্রাচীন মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁদের আগের বিদ্বেষী মনোভাব সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছিল এই সময়। কারণ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কাঠামোয় খুব ভালোভাবে খাপ খাওয়ানো যেত যে কোনো সামাজিক ও মূল্যবোধের গোঁড়ামিকে। তাঁদের ভয় ছিল শুধু আধুনিক চিন্তাধারার প্রসারকে কেন্দ্র করে।"[৬]

দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে জাতিগঠনের কর্মকাণ্ডে জড়ানো আশু দায় বলে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মধ্যশ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব ঘুচানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিলেন দেশের জনগণকে। কেননা এই মিলন, সকলের অংশগ্রহণ ব্যাতিরেকে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব। 'কালান্তর' গ্রন্থে কবি বলেছেন - "আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের মোটের উপর সমস্ত ভদ্র সাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ট করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি', নিম্নতনদের সহিত ন্যায় ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে, এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে-- সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।"[৭]

নরমপন্থীরাই প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ছিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে, গণসামর্থ্যের শক্তিতে গণসংগ্রাম গড়ে তোলা তাদের কর্মসূচি ছিল না। এসময়ে তাঁরা নিজেরাই কংগ্রেসের ভিতরেই

সমালোচিত হলেন যে তাঁরা 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' অবলম্বন করেছেন। "এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি।"[৮] মধ্যপন্থীদের সংস্কার আন্দোলন মানুষের মনে আর কোনো সাড়া জাগাতে পারছিল না; তাঁদের জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটছিল নতুন এক শ্রেণির নেতার। তাঁদের দাবি ছিল আরো চরম, তাদের জাতীয়তাবাদের চরিত্রও ছিল আরো উগ্র। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁরা 'চরমপন্থী' বলে পরিচিত। এতদিন মধ্যপন্থীরা নির্ভর করেছিলেন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপর, চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের আহ্বান পৌঁছে দিলেন ব্যাপকতর সামাজিক পরিধিতে- নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ, ছাত্রসম্প্রদায়, এমন-কি, মজুরও কৃষকদের কাছে ও তাঁদের ডাক পৌঁছল।[৯]

এই চরমপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটল কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে। নরমপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকেই নিজস্ব সরকারের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু চরমপন্থীরা 'পূর্ণ স্বরাজ' দাবি করলেন। তাঁদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা রইল না। এবং ক্রমে ক্রমে তাঁরা বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশি বস্তু ব্যবহারের ডাক দিলেন। বঙ্গভঙ্গ ও সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ মূর্ত হল বারানসী অধিবেশনে। বালগঙ্গাধর তিলক 'স্বদেশী' 'বয়কট' ও জাতীয় শিক্ষা গঠনের (National Education) উপর জোর দিলেন। কারণ তাঁর মতে 'স্বরাজ'ই এদের প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের এই 'স্বরাজ' আনয়নের পদ্ধতিকে তীব্র সমালোচনা করছেন এই বলে যে "আমরা কনগ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু,আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করিনি। কেবলই নিজেকে এবং

অন্যকে এই বলেই ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এমনি করে কর্তব্যকে সুদূরে ঠেকিয়ে রাখা অকর্মণ্যতার শূন্যগর্ভ কৈফিয়ত রচনা করা, নিরুৎসুক দুর্বল চিত্তেরই পক্ষে সম্ভব। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে একথা বলাও যা আর আগে ধনলাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে একথা বলাও তাই।..... আগে স্বরাজ আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথাও তেমনিই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ। [১০]

দেশের লোককে না জাগিয়ে, অন্ধভাবে চরকা কাটায় নিযুক্ত করলেই 'স্বরাজ' আসতে যে পারে না, রবীন্দ্রনাথ একথাটা বারবার বলেছেন। তাঁর ভাষায় -- "সম্মিলিত আত্মকর্তৃত্বের চর্চা, তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জন সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিত্তির উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে। গ্রামে গ্রামে অন্তরে বাহিরে তার অভাব আর সেই অভাবই যখন দেশের লোকের অন্নের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, জ্ঞানের অভাব, আনন্দের অভাবের মূল হয়ে উঠেছে, তখন দেশের জনসংঘের এই চিত্ত দৈন্যকে ছাড়িয়ে উঠে কোনো বাহ্য অনুষ্ঠানের জোরে এদেশে স্বরাজ কায়েম হতে পারে; একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।"[১১] রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে এও বলেছেন যে "যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য- অন্ন- উপার্জনে আনন্দবিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে। তার পরে একটা দীপের থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে।"[১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ নিবন্ধে স্বরাজ প্রসঙ্গে বারবার কংগ্রেসের সঠিক কর্মসূচির অভাবের কথা বলেছেন। ".... স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহুবিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য;তাতে যেমন আকাঙ্ক্ষা এবং হৃদয়াবেগ তেমনি তথ্যানুসন্ধান এবং বিচারবুদ্ধি

চাই। তাতে যারা অর্থশাস্ত্রবিৎ তাঁদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিৎ তাঁদের খাটতে হবে, শিক্ষাতত্ত্ববিৎ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিৎ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে। অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণউদ্যমে জাগতে হবে।"[১৩]

স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়েছিল এবং ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলনের ফলে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির জাগরণ ঘটল যুবশক্তির কাছে। ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছাকাছি তারা পৌঁছুতে পেরেছিলেন। সুতরাং ভারতীয় গণজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁরা এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন। চরমপন্থীদের ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম নিয়ে আসার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। "হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু কিছু চরমপন্থীর এত যুক্তিহীন গোঁড়ামি ছিল যে মুসলমানদের তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখেন। তবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের কথা।" [১৪]

তবে একথা বলা চলে তাঁরা কোনোমতেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে বিরোধ চরমে দেখা দিল, কারণ তাঁদের আদর্শ ও পথ ভিন্ন ছিল। প্রিন্স অব ওয়েলসকে সংবর্ধনা দেওয়ার অথবা সত্যাগ্রহ দ্বারা বঙ্গবিভাজনের বিরোধিতা করা হবে কি না এই নিয়ে চরম বিরোধ দেখা দিল। এছাড়া স্বরাজ, বয়কট, স্বদেশি এবং জাতীয় শিক্ষা এসব নিয়ে বিরোধ চরমে উঠল। এবং কংগ্রেসে ভাঙন দেখা দিল। চরমপন্থী নেতারা রাজনীতির মূল স্রোত থেকে সরে দাঁড়ালেন বা সরে আসতে বাধ্য হলেন। "তিলক,'কাল' পত্রিকার সম্পাদক পরাঞ্জপের ভাগ্যে জুটল কারাবাস। এছাড়া বাংলার নয়জন রাজনৈতিক নেতাকে দেশান্তরে নির্বাসিত করা হল। মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিল্লাই এবং অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও হলেন কারারুদ্ধ। ..... ব্রিটিশ রাজ্য পরিত্যাগ করে অরবিন্দ এই সময় পণ্ডিচেরীতে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলেন এবং রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ থেকে সম্পূর্ণভাবে

বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মের পথ গ্রহণ করলেন।" [১৫] ফলে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁরা মূল্যহীন হয়ে পড়লেন। এভাবে জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ল এবং এই সুযোগে সরকার কিছু দমনমূলক আইন পাস করিয়ে নিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চরমপন্থীরা সূচনা করেছিলেন এক গৌরবময় অধ্যায়ের। সংগ্রামের লক্ষ্য কী সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল স্বচ্ছ। জনসাধারণকে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন, সংগ্রামের বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁরা টেনে আনতে পেরেছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে এবং ছাত্রসম্প্রদায়কে। দেশের তরুণেরা, এমন-কি, মহিলারাও তাঁদের সংগ্রামী আহ্বানে সাড়া দেন। "রাজনৈতিক সংগঠন ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রবর্তন করেছিলেন অনেক অভিনব পদ্ধতি। ..... কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের ভাবাদর্শে ছিল উচ্চবর্ণ এবং হিন্দুধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব জাতীয় ঐক্যবোধের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার যে বীভৎস পরিণতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল, চরমপন্থীদের ভাবাদর্শ তার জন্য অনেকখানি দায়ি।" [১৬]

চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ এবং সরকারের দমনমূলক আইন এবং রুশ বিপ্লব, তুর্কী বিপ্লব এবং আর্য়াল্যাণ্ডের বিদ্রোহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় যুবকের দল উগ্রপন্থাকে অবলম্বন করে উদ্দীপিত হল। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাবলীর সূচনা, দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে তা বিপ্লবের অদম্য স্পৃহা জাগিয়ে তুলল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে তাঁদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সংস্কার আন্দোলন, এমনকি,চরমপন্থী সংগ্রামেও তাঁদের আর-কোনো আস্থা ছিল না; তাঁরা চাইলেন বাহুবলে ব্রিটিশকে এ দেশ থেকে উৎখাত করতে।

এই আন্দোলনকারীরা তাঁদের মাতৃভূমিকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন এবং ইংরেজদের মেরে এদেশ থেকে তাড়াবেন এমন স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এঁরা ইংরেজ সরকারকে তাদের

কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলেন। এবং ইংরেজ অফিসারকে মেরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইলেন। এই আন্দোলন সফল না হওয়ার মূলে রয়েছে এঁদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার বিফলতা, এঁদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এবং সাংগঠনিক শক্তির অভাব এঁদের সফল হতে দেয়নি। এঁরা ছোট ছোট দলে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করেছিলেন। "মৃত্যুভয় জয় করে অনুদ্‌বিগ্ন চিত্তে যেভাবে তাঁরা বেপরোয়া কাজ আর দুঃসাহসী পরিকল্পনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাতে দেশবাসীর মনে তাঁদের জন্য স্থায়ী আসন পাতা আছে। কিন্তু তাদের সকল আদর্শ সকল আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বীরোচিত হলেও তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল বিচ্ছিন্ন, কিছু লোকের জীবননাশের চেষ্টার মধ্যে সীমিত, ফলে সাধারণ মানুষকে এ সংগ্রামের অংশীদার করে তোলা সম্ভব হয়নি।" [১৭] কংগ্রেস এদের সমর্থন করে নি। কিন্তু তবুও এঁদের দেশপ্রেম নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিতে পারে না। এঁদের হাসতে হাসতে দেশের জন্য প্রাণবিসর্জন দেওয়াকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এঁদের নিঃস্বার্থ আত্মবলিদান দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিল বলতে পারা যায়।

"মর্লে-মিন্টো সংস্কার ভারতবাসীর মনে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তাকে শান্ত করার জন্য ১৯১১ তে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বঙ্গভঙ্গ রদ হল। নতুন ব্যবস্থায় বিহার এবং উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের অংশ রইল না; অসম ও স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হল। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হল দিল্লীতে।" [১৮]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অন্যপথে চালিত করে দিল। কারণএই যুদ্ধ ইউরোপীয়দের মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানের মুখোশ খুলে দিল, এছাড়া রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব (১৯১৭) সকল দেশের সংগ্রামী জনতার জন্য অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে এল । এছাড়া সমস্ত ভারতবাসী বিশ্বযুদ্ধের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ভারতীয়

অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়ল। এছাড়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেছিল কিছু অধিকার পাওয়ার আশায়। "ভারতীয়রা যাতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় তার জন্য গান্ধীজি নিজে সক্রিয় ছিলেন; তাঁর আশা ছিল ভারতীয় সহযোগিতার স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারেরা স্বরাজের দাবি মেনে নেবেন।[১৯]

কিন্তু ১৯১৯ এর আইন ছাড়া আর কিছুই জুটলনা।তাছাড়া ব্রিটিশ সরকার শুধু 'হোমরুল'আন্দোলনকেই দমন করল না- ভারতীয় চরমপন্থীদের কঠিন হস্তে দমন করার জন্য কুখ্যাত 'রাওলাট'আইন প্রণয়ন করল। এই টালমাটাল সময়েই ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অনুপ্রবেশ ঘটল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন "বহুদিন ধরে আমাদের পোলিটিকাল নেতারা ইংরেজি পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি -ইতিহাস পড়া একটা পুঁথিগত দেশ.... তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে -- তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। .... সত্যের যে কী শক্তি মহাত্মার কল্যাণে আজ তা আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি।[২০]

কিন্তু তাঁর আহ্বানের অপূর্ণতার কথা অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ এও বলেছিলেন যে "দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এক সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে, অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর, কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে।"[২১] মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর অহিংস নীতি, হিন্দু মুসলমান-সম্প্রীতি এবং নিম্নজাতির লোকেদের উত্থান এবং মহিলাদের উন্নতি সাধন করার নীতির জন্য কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তাঁর সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক সাড়া ফেলল। বস্তুত তাঁর উদ্যোগেই কংগ্রেস সাধারণ লোকের

দল হিসেবে পরিগণিত হয়ে উঠল।.... "গান্ধীজির আবির্ভাবের আগে শহরাঞ্চলে নিম্ন মধ্যবিত্ত,মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যেই সীমিত ছিল জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতি। জনগণের দাবিকে তাঁরা সমর্থন করতেন না তা নয়। তবু সক্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল তাঁদেরই হাতে। গান্ধীজির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, জনসাধারণ সংগ্রামের সক্রিয় অংশীদার হয়ে উঠল।" [২২]

গান্ধী প্রথম রাওলাট আইন প্রত্যাহারের জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। হরতাল, সত্যাগ্রহ, অনশন এবং মিছিল আরম্ভ হল। শুরুতে জনতার প্রতিবাদ ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু সরকার কড়া হাতে এই বিদ্রোহ দমন করতে চাইলে কখনো কখনো আন্দোলন হিংসাপূর্ণ হয়ে উঠল। গান্ধী হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ বর্জন করে দিলেন।

সাধারণ মানুষ এই সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। এছাড়া ব্রিটিশ সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক জেনারেল ও'ডায়ার ও পাঞ্জাব সরকারকে সমর্থন জানালে জনসাধারণ ক্ষোভে জ্বলতে লাগল। ব্রিটিশরা ভারতের ওপর তার 'ডিভাইড এণ্ড রুল' নীতি চালু রেখে হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদা বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিল। কংগ্রেস অবশ্য এ দুটো ধর্মের আদর্শ একই বলে কাজ করে যেতে লাগলেন। "গান্ধীজি অবশ্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে অত্যন্ত সরলভাবে হৃদয়ের মিলন বলে ভাবতেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় তিনি লিখেছিলেন, "মুসলমানকে যদি আমি আমার ভাই বলে মনে করি তাহলে তার বিপদ উপস্থিত হলে এবং ন্যায় তার দিকে আছে বুঝতে পারলে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আমার কর্তব্য।" [২৩]

গান্ধী জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা দাবি করলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। এবং অন্যান্য অনেক দাবি পেশ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী নেতাদের বিরোধ কিছুটা কমিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে তিনি নিপুণভাবে

মিশ্রণ ঘটালেন মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী ভাবাদর্শের, মধ্যপন্থীদের মতো তিনিও চাইলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকেই ভারত স্বরাজ লাভ করবে, আর স্বরাজ লাভের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি গ্রহণ করলেন চরমপন্থী পথ, অসহযোগ। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা পর্যন্ত তাঁকে একবার সুযোগ দেবার পক্ষপাতী হয়ে উঠলেন। গুজরাট এবং বিহার কংগ্রেস কমিটি ইতিমধ্যেই তাঁকে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন সরকারের সঙ্গে সকল প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত সংস্রব বর্জন করে শুরু হল। বিদেশি দ্রব্য বর্জন, আইন-আদালত বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন, নির্বাচন প্রভৃতি বয়কটের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। এ ছাড়া ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে দৃঢ় সম্প্রীতি। এই আন্দোলন জনমনে বিরাট আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেই এর অহিংস নীতিতে মোহিত হয়ে পড়েছিল। স্বদেশি খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। খাদি স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ালো এবং স্বরাজ ফাণ্ড একেবারে ভরে উঠল। জনগণের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে ধর্ম-নিরপেক্ষ কংগ্রেস পার্টি প্রস্তুত হল গান্ধীজির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নামতে- এবার হাতে তার অভিনব হাতিয়ার। কংগ্রেস প্রার্থীরা ইতিমধ্যে সবাই নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এবার আইনজীবিরা কোর্ট-কাছারি বয়কট করতে শুরু করলেন। শুরু হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশি কাপড় আর মদের দোকান বয়কট। চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করলেন, 'শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজের আর অপেক্ষা করার সময় নেই।'[২৪] অসংখ্য ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল, শিক্ষকরাও পদত্যাগ করলেন দলে দলে।

কিন্তু সরকার এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য সকল ধরণের নৃশংস পথ অবলম্বন করলো। ফলে নিরস্ত্র অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী জনগণ কোনো কোনো জায়গায় হিংস্র হয়ে উঠলো এবং আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে পড়লো। যেমন-চৌরিচৌরা থানায় পুলিশের যথেচ্ছ

গুলিচালনার প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু চাষি আগুন লাগিয়ে দিল, ফলে মারা পড়ল বাইশ জন পুলিশ কর্মচারী। গান্ধীজি এর প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, কারণ অহিংস নীতিতে আন্দোলন আর চলছে না বলে। এছাড়া খিলাফত আন্দোলন মুস্তাফা কামাল পাশার জয়ে তার গুরুত্ব হারালো। এভাবে অসহযোগ আন্দোলন কোনো কিছুই অর্জন করতে পারলো না। এই আন্দোলন এভাবে মাঝপথে আটকে যাওয়াতে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং কংগ্রেসের বিভেদ প্রকাশ্যে চলে এল। এ সুযোগে গান্ধীজিকে ছয় বৎসরের জন্য জেলে পাঠানো হলো। আবার অসুস্থতার জন্য তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হলো ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ এ। এসময় কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হল নির্বাচনে যোগদান করে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যোগদান করা নিয়ে। 'একপক্ষ যোগদান করে কাউন্সিলে প্রবেশ করে আইনের পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং আরেক দল এর বিরোধী' এই দুই দল যথাক্রমে 'পরিবর্তন সমর্থক' এবং 'পরিবর্তন বিরোধী' নামে অভিহিত হল। 'পরিবর্তন সমর্থক' হচ্ছেন চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরু। আর রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ এই 'পরিবর্তন বিরোধী' দল। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার সপক্ষে বলিষ্ঠ আবেদন রাখলেন। কিন্তু জয় হল রাজাগোপালাচারী দলেরই। চিত্তরঞ্জন পদত্যাগ করে মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল, মালব্য এবং জয়াকার এর সহযোগিতায় কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নতুন দল গঠন করে করলেন তার নাম হল কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ পার্টি। এই নতুন পার্টিও অহিংসা ও অসহযোগের মৌলিক ও প্রাথমিক নীতিকে আশ্রয় করে সংগঠিত হল। এরা চাইলেন সংবিধান রচনার অধিকার। আর যদি তা না পারেন তবে সাংবিধানিক কাজকর্মে বাধাপ্রদান করবেন। ১৯২৩ সনের নির্বাচনে তারা লিবারাল ও উদারপন্থী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন। স্বরাজীরা "সেন্ট্রাল প্রভিন্সে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন, বাংলাদেশের কাউন্সিলের পার্টি হিসেবে তাঁরা লাভ

করলেন সবচেয়ে বেশি আসন। উত্তরপ্রদেশ এবং আসামে তাঁদের স্থান হল দ্বিতীয়। [২৫]

এসব সত্ত্বেও স্বরাজবাদীদের পথ সম্পর্কে 'পরিবর্তন বিরোধী'রা মত পাল্টালেন না। তাই দুইদলের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেঁধে উঠল। অবশ্য উভয় দলের মধ্যেই গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল অটুট। কেন্দ্রীয় আইনসভার ত্রিশজন মধ্যপন্থী ও মুসলমান সদস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বরাজবাদীরা গঠন করলেন ন্যাশনাসিস্ট বা জাতীয়তাবাদী পার্টি। 'দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণিও ভাগ হয়ে গিয়েছিল দুই দলে: তাদের একদল উন্নত, অন্য দল অনগ্রসর।' অপেক্ষাকৃত তরুণ একটি দল এই সময় আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমাজবাদী আদর্শের প্রতি। রাশিয়ার সমাজবাদী ভাবধারায় উদ্বোধিত হয়ে দেশের তরুণ সমাজ ছোট ছোট দল গঠন করে কম্যুনিজম্ সম্পর্কে নিজেদের ব্যাখ্যা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত-ঘেঁষা রাজনীতিতে আইনসংক্রান্ত সংস্কারের দাবিই মুখ্য হয়ে উঠেছিল; কমিউনিস্টরা চাইলেন কংগ্রেস তাঁদের নিজেদের দাবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের মানবিক, সামাজিক, দাবিদাওয়াও সমস্যাও যুক্ত করুন।

কংগ্রেসের যুব সদস্যেরা যেমন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও জহওরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস সংবিধান তৈরি করল যাকে 'নেহরু রিপোর্ট' বলা হয়। এঁদের নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতবর্ষের 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' ত্যাগ করে পূর্ণ স্বরাজ' দাবি করল। লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ বা সামগ্রিক সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রতি কংগ্রেস সুনিশ্চিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হ'ল। ডোমিনিয়ন স্টেটাস-এর সীমিত স্বাধীনতার চিন্তায় সন্তুষ্ট থাকা আর কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব ছিল না; 'দীর্ঘ অপেক্ষার পর তুচ্ছ সংস্কারের' সান্ত্বনা নিয়ে কাল কাটানোর দিনও শেষ হয়ে গেল।

"লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে নেতাদের মধ্যে আদৌ একতা ছিল না। পুরনো ও নতুন নেতাদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল। নরমপন্থী

নেতাদের প্রাধান্য হ্রাস পেতে লাগল এবং যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বামপন্থী নেতাদের প্রভাব বাড়তে লাগল। একদিকে যাঁরা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট যেমন মতিলাল নেহরু ও গান্ধীজি, অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে অটল।"[২৬]

গান্ধীজি চরমপন্থীদের পূর্ণস্বরাজ দাবি সমর্থন করলেন, এবং দাবি পূরণের নিমিত্তে 'ডাণ্ডি যাত্রা' শুরু করে লবণ আইন অমান্য করে ১২ মার্চ ১৯৩০ সনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। সরকার শক্ত হতে আন্দোলন দমন করতে চাইলেন। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করল না। দ্বিতীয়টি কোনো ফলপ্রসু হল না। ১৯৩৩ এর জুনমাসে আইন অমান্য বন্ধ করে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়। কারণ সত্যাগ্রহ শুরু করার আগেই এবং সরকারী ডিপো ধরসনাতে লবণ তৈরি করতে পারার আগেই গান্ধীজি গ্রেফতার হলেন।

দেশের বিভিন্ন অংশে এই অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার ফলে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হল। পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে সূর্যসনের নেতৃত্বে কিছু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। তাঁরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারগুলি একসঙ্গে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের পাশাপাশি কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯৩০ সালে কর না দেওয়ার আন্দোলন থেকে এই বিদ্রোহের জন্ম হলেও এর আসল উৎস কৃষকশ্রেণির উপর জমিদারের অত্যাচার।

এই বিক্ষিপ্ত কৃষক বিদ্রোহগুলি থেকেই অখিল ভারতীয় কিষান সভার জন্ম হল। বিদ্রোহী কৃষক সমাজ নিজেদের শ্রেণিকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হলেন এবং শহরের যেসব বিপ্লবী গ্রামে কাজ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি তাঁরা সমর্থন জানাতেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই "বিভিন্ন শ্রেণি-সংগ্রাম গণ আন্দোলনের ধারার সঙ্গে মিলে যায় ও পরে আইন ভঙ্গ আন্দোলনের রূপ নেয়। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে এই সংগ্রামের

সবগুলিই গান্ধীজির অহিংস নীতির ভিত্তিতে গঠিত হয়নি।[২৭]

সরকার ম্যাকডোনাল্ড পুরস্কার বা সাম্প্রদায়িক রায় চালু করল যাতে হিন্দুদের থেকে দলিতদের আলাদা করে তাদের জন্য নির্বাচক মণ্ডলী পৃথক হবে বলে স্থির করা হল। হিন্দু ও হরিজনদের দুটো পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হবে। যাতে ভারতবর্ষে কখনো একতা থাকতে না পারে। এই সাম্প্রদায়িক রায়কে গান্ধীজি বিরোধিতা করলেন। কিন্তু হিন্দু নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা রায়ে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের দাবি করলেন। পুনার এই চুক্তি সরকার কর্তৃক সাম্প্রদায়িক রায়ের সংশোধন হিসেবে গৃহীত হল। এভাবে অখিল ভারতীয় অস্পৃশ্যতা এবং অস্পৃশ্য সমাজ সেবক লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কংগ্রেস প্রভাব বৃদ্ধি পেল। তবে " ১৯৩০ এর আন্দোলনের তুলনায় জনসাধারণের ওপর দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের (প্রকৃতপক্ষে একে ব্যক্তিগত আইন অমান্য বলা উচিত) প্রভাব সামান্যই। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে কংগ্রেস প্রভাব অক্ষুণ্ণই রইল। কর না দেওয়া ও খাজনা না দেওয়ার আন্দোলন উত্তর প্রদেশে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বজায় রইল।" [২৮]

১৯৩২ সালের তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন আইন ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৩৫) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই আইনে কতকগুলি নতুন সংস্কারের প্রস্তাব ছিল। এতে বলা হল যে "কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়; কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে এই প্রথম প্রত্যক্ষ ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হল-- বলা হল যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে একত্রিত করে।" [২৯] এই অ্যাক্ট প্রণয়ণের আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় নেতাদের সাম্রাজ্যবাদী মতের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজাদের ব্যবহার করা। কংগ্রেস এই অ্যাক্টের বিরোধী হলেও নিজেদের গণসমর্থন বোঝানোর

জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে এগারোটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শুধু বাংলা ও পাঞ্জাবেই অ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসেও শাসন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেন নি। অবশ্য এর জন্য প্রাদেশিক সরকারের 'ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা' এবং 'পুরনোপন্থী সদস্যের আধিক্যকেই' দায়ি করা হয়। এর আর একটা কারণও ছিল। " কংগ্রেসে শ্রমিক এবং কৃষক যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণির লোক। যেটুকু ক্ষমতা ওঁদের হাতে এল তা দিয়ে জনসাধারণের উন্নতি করার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার এবং স্বাস্থ্যের মান উন্নত করার দিকে তাঁরা বিশেষ নজর দেন। গরিব কৃষকদের ঋণ-মুক্তির জন্য ও জমির বিলি ব্যবস্থার জন্য নতুন আইন পাস করা হল। তবে এই ধরনের আইন জমিদার ও ভূস্বামীদের সম্মতি নিয়ে প্রবর্তন করা হল বলে অনেকটা আপসের চেষ্টা এই আইনের মধ্যে দেখা যায়।"[৩০]

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর (মার্চ ১৯৪১) ভারতীয় নেতারা অনুভব করতে আরম্ভ করলেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে নারাজ। এতে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। ফলস্বরূপ ১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুম্বাইয়ের সভাতে মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো "to launch wide spread civil disobedience movement to force the British Government to Quit India giving the slogan "Do or Die". Gandhiji said "we have put the congress at stake, Either it will be victorious or it will be finished."[৩১]

ব্রিটিশ সরকারও কড়া দমননীতি গ্রহণ করলো। মুম্বাইতে গান্ধী নেহরু ও অন্যান্য

নেতাদের কারাবন্দি করা হলো। কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সমস্ত ভারতবাসীর মনে অভূত-পূর্ব সাড়া জাগালো। এর বর্ণনা আমরা প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র, জে. কে. তোমর এর গ্রন্থে পাই। জে. কে. তোমর 'History of Modern India' গ্রন্থে আগস্ট আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেছেন, "Processions took place all over India. With the help of the police and the army, the Government killed hundreds of people within a few days. Within a short time the movement assumed the form of a revolt in many places. In a fit of anger the public resorted to destroying the public property. The slogan "Quit India" began resounding in every street of the country."[৩২] বিপান চন্দ্র ও India's struggle for Independence গ্রন্থে আন্দোলনের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন — শহরের পাশাপাশি গ্রামের থেকেও মানুষ বেরিয়ে এসে তাদের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে লাগল, ৯ আগস্টের পরবর্তী ছয় সাত সপ্তাহ ধরে সারা দেশ ব্যাপী এক ভীষণ জনগণের প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে লাগল। "People devised a variety of ways of expressing their anger. In some places, huge crowds attacked police stations, post offices, kutcheries (courts), railway stations and other symbols of Government authority. National flags were forcibly hoisted on public buildings in defiance of the police. At other places, groups of Satyagrahis offered arrest in tehsil or district headquarters. Crowds of villagers, often numbering a few hundreds or even a couple of thousand, physically removed railway tracks.... small groups of individual blew up bridges ... cut telephone and telegraph wires."[৩৩] বিপান চন্দ্র জনগনের রোষের একটি তথ্য পেশ করেছেন "According to official estimates, in the first week

after the arrests of the leaders, 250 railway stations were damaged or destroyed, and over 500 post offices and 150 police stations were attacked. The movement of trains in Bihar and Eastern UP, was disrupted for many weeks. In Karnataka alone, there were 1600 incidents of cutting telegraph lines and twenty six railway stations and thirty two post offices were attacked".[৩৪]

জনগণের এই স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সমগ্র ভারতবর্ষ দুলে উঠছিল। মনে হয়েছিল যেন The slogan 'Quit India' began resounding in every street of the country'.[৩৫]

ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে বানচাল করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করছিল। নিরস্ত্র জনতা পুলিশের গুলির সুখোমুখি হয়েছিল। প্রায় ১০,০০০ হাজার লোকের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য গ্রামবাসীরা আগেই গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করেছিল। ১৯৪২ এর শেষে ৬০,০০০ এর ও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২৬০০০ লোককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।[৩৬]

এই ভাবে সরকার নির্দয় হস্তে এই আন্দোলনকে দমন করতে সহ্লম হয়েছিল।

২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দেশ যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল সেইসময়ে বাংলার মানুষ প্রত্যহ্ল করল এক বিধ্বংসী যুগান্তকারী ঘটনা, যা কেড়ে নিয়েছিল প্রায় ত্রিশ লহ্ল প্রাণ। ঘটনাটি হল পঞ্চাশের মন্বন্তর। 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্-ব' গ্রন্থে অমলেন্দু সেনগুপ্ত বলেছেন "ফ্যাসিজমের অমানবিক রূপ সাধারণ মানুষের অদেখা ও অজানা। তবুও সুদূরের যুদ্ধ এগিয়ে

এসে গ্রাস করল তার দিনরাত্রি। তার নিষ্প্রদীপ বিনিদ্র রাত সাইরেনের তীব্র আর্তনাদে খানখান হয়ে যায়। অসহায় চোখ মেলে সে দেখে বিদেশি সৈন্যদের দাপাদাপি আর রাজপথে ক্ষুধিত কঙ্কালের মিছিল। রুদ্ধ দুয়ারের ওপার থেকে শোনা যায় ক্ষুধাতুর শিশুর কান্না। যুদ্ধ হানা দিয়েছে আকাল আর মারী-মড়কের চেহারা নিয়ে।”[৩৭]

সুমিত সরকারের ভাষায়, "The food crisis was caused fundamentally by stoppage of rice imports from Burma and South -East Asia coinciding with the need to feed a vastly enlarged army, but it was greatly aggravated by gross mismanagement and deliberate profiteering. Rationing measures were extremely belated and confined to a few big citites... In the terrible summer and autumn of 1943, lakhs trekked to Calcutta to starve to death on its streets, begging no longer for rice, but just for the water in which it had been cooked."[৩৮]

তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো বলেছেন যে “The worst affected areas were the Tamluk Contai-Diamond Harbar region of South-West Bengal, and the districts of Dacca, Faridpur, Tippera and Noakhali. Bengal's small peasant economy suffered a shattering blow, with 600,000 tenants losing their holdings during 1943 and cattle wealth going down by 20% in a single year. Agriculture labourers not expectedly, were the worst sufferers, in a survey of five Faridpur villages in 1944, 40.3% were found to have been 'wiped off' as against an aggregate mortality of 15.2%”[৩৯]

বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে অনেক লেখালেখিই প্রকাশিত হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা

দুর্ভিক্ষের যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যায় Famine Inquiry Commission, India (1943) এর রিপোর্ট অনুযায়ী মন্বন্তরে মারা গিয়েছিল প্রায় '1.5 million মানুষ। তবে এই কমিশনের একজন সদস্য W.R. Aykroyd এর মতে "I now think it was an under estimate especially in that it took little account of roadside deaths , but not as gross as under estimate as some crities of the commissions report, who preferred there to four million, declared it to be."[৪০]

সুমিত সরকারও ১.৫ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়ন পর্যন্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। "Between one and a half to three million perised in Bengal in a basically man made famine."[৪১]

সরকারী অনুসন্ধানকারী দল ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে একাধিক ঐতিহাসিক ও গবেষক পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আমেরিকার গবেষক পল আর গ্রীনো (Paul R Greenough), বি.এম.ভাটিয়া এবং অমর্ত্য সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিশন প্রদত্ত তথ্যসমূহকে এঁরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রয়োজনমতো উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহকারে তা খণ্ডন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বাংলায় সাধারণত তিনবার ধান উৎপন্ন হয়। (১) আমন,বপন করা হয় মে,জুন মাসে, কাটা হয় নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে (শীতকালীন শস্য) (২) আউস, বপন করা হয় এপ্রিল মাসে, কাটা হয় আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে(শরৎকালীন শস্য), এবং বোরো ধানের বীজ বপন করা হয় নভেম্বরে আর কাটা হয় ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাসে। ১৯৪২ সনে এই তিনধরনের ধানের উৎপাদন অন্যান্য বছরের তুলনায় কম হয়েছিল। কারণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অক্টোবর মাসে সাইক্লোন এবং প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে হয়েছিল 'fungus' (রোগপোকার) আক্রমণ।

দ্বিতীয় কারণ, জাপান কর্তৃক বর্মা আক্রমণ — রেঙ্গুনের পতন হয় ১০ই মার্চ ১৯৪২ তারিখে। যার ফলে সেখান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হল। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, "In view of the cyclone, flooding, fungus diseases, the disruption of the war, and the loss of Burma rice, that its primary causes should be seen in the serious shortage in the total supply of rice available for consumption in Bengal as compared with the total supply normally available"[৪২]

ড. অর্মত্য সেন তাঁর 'Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation' গ্রন্থের 'The Great Bengal Famine' প্রবন্ধে পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং তার থেকে বিগত কয়েক বৎসরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শস্যোৎপাদনের হার পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন ১৯৪৩ সনের খাদ্যশস্যের সরবরাহ তার আগের পাঁচ বছরের গড়ের মাত্র ৫ শতাংশ বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালে দুর্ভিক্ষ হল না, হল ১৯৪৩ সালে। "The current supply for 1943 was only about 5 percent lower than the average of the preceding five years. It was infact, 13 percent higher than 1941, and there was, of course, no famine in 1941.[৪৩]

আসলে এই চাল উৎপাদন কম হওয়া কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না। বাংলা, বিহার,উড়িষ্যার চাল এবং পাঞ্জাবে গমের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো অথবা তার থেকে কিছু বেশিই হয়েছিল। তবুও বাঙালির খাদ্যে টান পড়ল। কারণ অনেক বছর থেকে বাংলায় খাদ্যশস্যের অভাব মিটছিল না। তার প্রয়োজনের চাল পুরোপুরি উৎপাদিত হত না। এর জন্য দায়ি "ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিনীতি"[৪৪]

এই সূত্রটিকে বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে যে ভূমিব্যবস্থার প্রচলন হয় তাতে যে নতুন জমিদারগোষ্ঠীর পত্তন হয়

তাদের ইংরাজ আনুগত্য এবং প্রচণ্ড অর্থলোভ কৃষককূলকে করভারে জর্জরিত করে তোলে। আরো পরে তালুকদার জোতদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের উত্থান বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের জমির উন্নয়ন উপেক্ষিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে, জমি চাষের উপযোগী হয়ে ওঠেনি; ফলে দেশের কৃষিতে গতিহীনতা এবং তার অনিবার্য পরিণাম খাদ্যশস্যের উৎপাদন-হার কমে যাওয়া। তাছাড়া ইংরেজ সরকার খাদ্য শস্য উৎপাদনের পরিবর্তে 'non-food crops, অর্থাৎ যে সব কৃষিজাত কাঁচামাল শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তার উৎপাদনে চাষিদের উৎসাহিত করে, ফলে প্রধান খাদ্যশস্য ধানের উৎপাদন একসময় ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এই খাদ্য-ঘাটতি পূরণ করা হত পূর্ব-এশিয়া, বিশেষত বর্মা থেকে চাল আমদানি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অবস্থা এক জটিল রূপ ধারণ করে। কেননা অবস্থানগত সুযোগসুবিধার জন্য বাংলাদেশে প্রচুর আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধের সময় মোতায়েন করা হয়েছিল। এই সেনাবাহিনীকে খাদ্য যোগান দিতে গিয়ে সরকারকে বাজার থেকে অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে হল।

দ্বিতীয়ত, মিত্রশক্তির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষের মজুত খাদ্যভাণ্ডার থেকে নিয়মিত খাদ্যসামগ্রী পাঠাতে থাকে— ফলে মজুত খাদ্যশস্যে টান পড়ে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই বাংলাদেশের খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বিচলিত হয় ।চাহিদার তুলনায় যোগান ঘাটতি পড়ে। পরিস্থিতি আরো জটিল হয় যখন জাপান বর্মা দখল করে, তখন সেখানে চাল আমদানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। Famine Inquiry commission এই খাদ্য ঘাটতিকেই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ি করেছে। " the loss of Burma rice that its primary cause should be seen in the serious shortage in the total supply of rice available for consumption in

Bengal as comapred with the total supply normally available."[৪৫] কিন্তু চালের উৎপাদন হ্রাস এবং বর্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ হলেও সরবরাহের এমন কোনো ঘাটতি ছিল না যাতে এই ধরনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটতে পারে। কারণ সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৩ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে বাংলাদেশে চালের যোগান কম ছিল, অথচ সে বছর আকাল হয় নি। আসলে যুদ্ধের সময় আমদানি কমলেও চালের রপ্তানি বেড়ে গিয়েছিল ভীষণভাবে; সিংহলে প্রচুর চাল রপ্তানি হয়েছিল—সেনাবাহিনীর জন্য। ফলে এইসময় বাংলাদেশ তার প্রয়োজনীয় চাল পায় নি।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে FAD অর্থাৎ Food Availability Decline তত্ত্ব নস্যাৎ করে দিয়েছেন—"It seems safe to conclude that the disastrous Bengal Famine was not the reflection of a remarkable overall shortage of food grains in Bengal"[৪৬]

বি.এম ভাটিয়া এবং পল আর গ্রীনোও অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন যে শস্যহানি বা খাদ্য শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয় নি। দুর্ভিক্ষ হয়েছে "বন্টন পর্যায়ে মারাত্মক দুর্নীতি, অবিমৃষ্যকারিতা, এবং সরকারী দূরদর্শিতার অভাব ও চরম গাফিলতি এই দুর্ভিক্ষের জন্য মূলত দায়ি।"[৪৭] এখানেই প্রমাণিত হয় যে মন্বন্তর প্রকৃতিসৃষ্ট নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। সরকার এবং মজুতদারেরা এসময়ে ত্রুটিপূর্ণ নীতিগ্রহণ করেছিল এবং তাদের দুর্নীতির ফলে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন 'FAD' বাতিল করে 'Exchange Entitlement এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একজন মানুষ সমাজকে তার শ্রম বা সেবা দিয়ে বিনিময়ে যেটুকু দ্রব্য বা সেবা পেতে পারে, সেটাই হল তার 'Exchange Entitlement.'। তাঁর মতে সরবরাহজনিত কোনো বিরাট ঘাটতি দুর্ভিক্ষের কারণ নয়। গণ্ডগোল বেধেছিল চাহিদার দিকে। পারিশ্রমিকের তুলনায় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যায় ভীষণভাবে। আর তাই বিনিময়

হার পড়ে যায়। মৎস্যজীবি সম্প্রদায় কৃষিহ্লেত্র বহির্ভূত শ্রমিক এবং বিভিন্ন হ্লুদ্রশিল্পজীবিরাই এই দুর্ভিহ্লে হ্লুতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। বিনিময়হারে এই বিপর্যয়ের কারণ অবশ্যই যুদ্ধ;– – যুদ্ধের খরচ চালনোর জন্য সরকারের আর্থিক নীতির রদবদল– বেশি করে নোট ছাপানো। ফলে প্রবল মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি। এছাড়া যুদ্ধের বাজারে 'পরে দাম আরো বাড়লে চাল বেচে আরো বেশি লাভে'র লোভে এক শ্রেণির মজুতদারদের উদ্যোগে মদত জোগালো অদূরদর্শী অদহ্লু ঔপনিবেশিক সরকার। একে তো যুদ্ধজনিত বিপর্যয়ের ফলে সম্ভাব্য খাদ্য সমস্যা প্রতিরোধকল্পে ভারত সরকার কোনোরকম ব্যবস্থাই নেয়নি, তারপরও সরকারী কয়েকটি সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। দেশের পূর্বাঞ্চলে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠলে সরকার পোড়ামাটি নীতি বা denial policy গ্রহণ করে। জাপানিদের অতর্কিত আক্রমণে আক্রান্ত অঞ্চলের সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী ও মূল যোগাযোগের মাধ্যম অর্থাৎ নৌকাগুলি যাতে তাদের হস্তগত না হয়, সেজন্য সরকার Rice Denial policy ও Boat Denial policy গ্রহণ করে। এই নীতি দুর্ভিহ্লের জন্য অনেকাংশে দায়ি। Rice Denial policy র মাধ্যমে সরকার সমস্ত সম্ভাব্য আক্রমণস্থল থেকে সমস্ত বাড়তি খাদ্য কিনে নিয়ে প্রদেশের সীমানার বাইরে পাঠাতে থাকে, ফলে সেইসমস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ অনিবার্যভাবেই কমে যায়। আর নৌকাগুলির বেশির ভাগই সামরিক কর্তৃপহ্লু হয় নিজেদের প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করে নতুবা নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখে। এই ভাবে পূর্ববঙ্গে যোগাযোগ এবং ব্যবসার একমাত্র মাধ্যম নৌকাচলাচল সরকারি নীতির ফলে প্রবলভাবে বিপর্যস্ত হয়, বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যসংকটের সৃষ্টি করে। জাপানি আক্রমণে বর্মা থেকে চাল আমদানির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেও সিংহল ইত্যাদি জায়গায় রপ্তানিতে সরকার নিরুৎসাহ ছিল না। আর এই অবিবেচক সরকারি অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করতে থাকে।

সরকার খাদ্যাভাবের এই সমস্যাকে প্রথম থেকে কোনো গুরুত্বই দেয় নি, ক্রমশ পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সরকার ভেবেছিল ছোট ছোট আড়তদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বারা প্রচুর পরিমাণে চাল মজুতের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এবং তৎকালীন বাংলার খাদ্যসচিব সুরাবর্দী বলেন, মজুতদারদের কাছ থেকে সঞ্চিত চাল বের করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে Food Drive কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও যে অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি চাল মজুত ছিল সেই কলকাতা এবং হাওড়া জেলাকেই এই কর্মসূচির এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি ও সরকারের উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল।[৪৮]

বিশেষত খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য সরকার-নিযুক্ত এজেন্টদের হৃদয়হীন স্বেচ্ছাচারিতা এবং দুর্নীতি, চোরাবাজারের ফুলে ফেঁপে ওঠা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বন্টন ব্যবস্থায় সরকারি শৈথিল্য অনাহারে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। বি.এম. ভাটিয়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন— "It was for the first time Bengal Famine that the part played by speculation in regulating prices of foodgrain in a period of draught and scarcity was officially recognized,"[৪৯]

এছাড়াও ঐতিহাসিকদের মতে বাংলার অধিকসংখ্যক কৃষক ছিল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বা বর্গাদার। চাষের খরচ বাদ দিয়ে বাকি উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক জমির মালিককে দিয়ে চাষি যা পেত তাতে তার সংসার চলত না। ফলে চাষে চাষির অনীহা সৃষ্টি হয়েছিল। এতে কৃষির মানের অবনয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের ভাগ্যে জুটেছিল অনাহার, অর্ধাহার এবং অপুষ্টিজনিত রোগভোগ। তাই বলা যায় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি অমনোযোগ ও ব্রিটিশ সরকারের দীর্ঘকালীন শোষণই ছিল ১৯৪৩-৪৪ জোড়া দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।

অবশ্য অধ্যাপক অর্মত্য সেনের মতে, সরকার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেনি। দুর্ভিক্ষ যখন

চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন বিস্মিত হয়েছিল। Exchange entitlement – এর বিপর্যয় ব্যতীত panic hoarding অর্থাৎ শস্যমজুত আর্থিক দিক থেকে লাভজনক হওয়ায় কৃষক ও ব্যবসায়ী কর্তৃক অত্যধিক পরিমাণে চাল মজুত রাখাকেও অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এছাড়া সরকারি তিনটি procurement scheme – এর অদক্ষ পরিচালনার ফলে মূল্যনিয়ন্ত্রণে কোনো কর্তৃত্ব না থাকায় মজুতদাররা স্ফীত হয়ে উঠেছিল। Basic Food plan – এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যের সুষম বন্টনের যে নীতি ছিল আগে,এই সময়ে তা কার্যকর না থাকায় এবং আমদানি রপ্তানির ভারসাম্যহীনতায় বাংলাদেশে খাদ্যসমস্যা সঙ্গীন হয়ে উঠে। এছাড়া যুদ্ধের কারণে কিছু লোকের ক্রয়ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, বিশেষত 'যুদ্ধব্যবসা'র সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত তাদের এইভাবে একশ্রেণির লোকের ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধি অর্থাৎ অন্যলোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস,– – এই সব ঘটনা ও মন্বন্তরের প্রেক্ষিত তৈরি করেছে।

১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবর এক প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে সমগ্র মেদিনীপুর জেলা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ফলে বিস্তরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শস্য। ত্রাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ববিভাগ ১৯৪২ এর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুরের প্রায় ১০ লক্ষ অভাবী মানুষের জন্য মাত্র ২১০০টন চাল সরবরাহ করতে পেরেছিল। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে চালের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। মোটা চালের দাম ১৯৩৯ এর ডিসেম্বরে ছিল মণ প্রতি পাঁচ টাকা আট আনা। ১৯৪২ এর ডিসেম্বরে সেই চালের দাম বেড়ে হল এগারো টাকা। চালের দামের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা যায় বেআইনি মজুত প্রবণতা এবং বর্মা থেকে আমদানি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া। সরকার চালের পাইকারি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়। ১৯৪২ সালে মূল্যস্ফীতির বিপজ্জনকতা খেয়াল করে মোটা চালের বিধিবদ্ধ সর্বাধিক দাম ধার্য করে মণপ্রতি ৫ টাকা ১২ আনা। এই আদেশের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে

কলকাতার বাজার থেকে শস্য উধাও হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ১৫ দিনের ব্যবধানে মনপ্রতি চালের মূল্য ১৫ টাকা থেকে ২২টাকায় গিয়ে পৌঁছয় সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহত হবার ফলে। এর মধ্যে সরকারি প্রশাসনিক স্তরে রদবদল, নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নে দোলাচলতা ইত্যাদি কারণে চালের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কৃষকেরা নিজেদের ঘরের চাল বিক্রিতে আগ্রহী ছিল, প্রচুর পরিমাণে মজুত চালের অধিকারী জমিদারেরা স্থানীয় জনতার হাতে প্রহৃত হবার আশঙ্কার পাশাপাশি সরকারের অল্পমূল্যে চাল অধিগ্রহণের ভয়েও উদ্বিগ্ন ছিল। সরকার চাল কেনার জন্য যেসব দালাল নিযুক্ত করেছিল তাদের ভূমিকাও ছিল স্বার্থপূর্ণ একপেশে। 'খাদ্য অভিযান' নামে মজুতদার-বিরোধী সরকারি কর্মসূচী বিফল হওয়ায় গ্রামবাংলাকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষার জন্য সুরাবর্দীর সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গেল। বড় হয়ে উঠল ভয়, অস্তিত্বরক্ষা এবং অর্থের জন্য লোভ। ভালো দাম দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং জোর দেখিয়েও গ্রামের মজুত চাল বের করা অথবা ধনীদের কাছ থেকে দরিদ্রদের মধ্যে চাল হস্তান্তর করার অভিপ্রায় ব্যর্থ হল। এইভাবেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, সরকারি ভ্রান্ত নীতি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর অমানবিক আচরণ — এই সমস্ত কিছুর যোগফল পঞ্চাশের মন্বন্তর।

৩

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষের দিকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল ছেচল্লিশের দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ ও তার অনুসঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা। এই ঘটনাগুলো পরস্পর - সম্পর্কিত। এই তিন ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঞ্জাব ও বাংলা। হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঘৃণা বয়ে এনেছিল দেশভাগ। অবশ্য এর অন্যান্য কারণও ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের মতভেদ এবং ব্রিটিশের অবর্তমানে স্বাধীন ভারতের

শাসনভারের কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে তৈরি হয়েছিল অবিশ্বাস। হ্ল মতার বিন্যাস ও অংশীদারিত্ব সম্পর্কে সহমতের অভাবই ছিল এর প্রধান কারণ। নেতৃবৃন্দের এই পারস্পরিক অসহযোগিতা ছড়িয়ে পড়ে তাদের অনুগামী হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে। ফলে পারস্পরিক হিংসা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাৎহ্লণিক সমাধান হিসেবে তখন দেশের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ দেশভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ– এই উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও দরকষাকষি করে সহমতের ভিত্তিতে দেশভাগ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ কর্তৃপহ্ল কর্তৃক ঘোষিত হয় ৩ জুন ১৯৪৭ তারিখে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকহ্লে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি এই মর্মে বিল পেশ করেন ৪ জুলাই ১৯৪৭। আলোচনার পর সেখানে বিলটি পাশ হয় ১৫ জুলাই। উচ্চতর কহ্ল হাউস অব লর্ডসে বিলটি পাশ হয় পরের দিন ১৬ জুলাই । বিলে রাজকীয় শিলমোহর পড়ে ১৮জুলাই । পাশ হওয়া আইন অনুযায়ী হ্ল মতা হস্তান্তর, দেশভাগ ও দেশ স্বাধীন হয় ১৫ই আগষ্ট। এই দেশভাগের ফলে দেড়কোটির বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হয়, এবং কমপহ্লে দশলহ্ল মানুষের জীবনহানি ঘটে।

আমরা দেশভাগের ইতিহাস ফিরে দেখার চেষ্টা করব। একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ব্রিটিশ শাসনের ফলেই জন্ম নিয়েছে। অখণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনা উনিশ শতকে ইংরেজি শিহ্লার ফলেই প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে তাঁদের 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেছেন যে, "ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে তার আশানুরূপ ব্যাপ্তি ঘটে নি। হিন্দু ও পার্শী নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ চেতনাকে নিজেদের মধ্যে যতটা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, মুসলমান নিম্মমধ্যবিত্ত শ্রেণি ততটা পারেন নি।"[৫০]

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান মোটামুটি সদ্ভাবের সঙ্গেই বসবাস

করছিলেন। ১৮৫৭ র বিদ্রোহেও হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সম্মিলিত ভাবেই লড়েছিলেন। চতুর ব্রিটিশ হিন্দু মুসলমানের ঐক্যে বাধা দেওয়ার নিমিত্তে বিভাজনের শাসন আরম্ভ করলেন। নতুন জাতীয়তাবাদকে দমন করতে একদিকে কড়া নীতি গ্রহণ করলেন , অন্যদিকে এদেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ, বিবাদ এবং অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ রোপণ করতে চেষ্টা করেন। 'বিভাজন ও শাসনের নীতি'র সূত্রপাত হ'ল এ থেকেই। ধর্মের ভিত্তিতে এদেশের মানুষকে দুটি আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তোলা ব্রিটিশেরই রাজনৈতিক অবদান। সংখ্যালঘু মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করে তাদের তাঁরা হাতে রাখতে চাইলেন। জমিদার,ভূস্বামী, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত— এঁদের সবাইকে নিজেদের দলে আনতেও তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।[৫১]

অবশ্য এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান বহুবছর ধরে পাশাপাশি শান্তিতে যেমন বাস করেছেন তেমনি তাঁদের সম্প্রদায়গত ভেদ কোনো সময়েই মুছে যায় নি। বাঙালির ধর্মভেদ, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ ছিল যথেষ্ট প্রকট। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে অবিভক্ত বাংলার ধনী শ্রেণি, জমিদার সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত মানুষ প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু, আর দরিদ্র কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সামাজিক ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ও সম্মান পেতেন না। এ প্রসঙ্গে হেনা সিনহা তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ, ভগ্ননীড়ের বেদনা' গ্রন্থে একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। "হিন্দু জমিদাররা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে চাঁদা তুলে যাত্রাগানের আসর বসাতেন। কিন্তু সে আসরে হিন্দুদের বসবার ব্যবস্থা থাকলেও মুসলিমদের জন্য কোনো ব্যবস্থা থাকত না। তাঁরা দাঁড়িয়ে যাত্রাগান শুনতেন।"[৫২]

সুতরাং মুসলমান সমাজে কিছুটা ক্ষোভ ছিলই। এছাড়া প্রধানত জমিদার ও অভিজাত

শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী, রক্ষণশীল ও আধুনিক শিক্ষাবিরোধী মনোভাব থাকায় ভারতীয় মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারল না। ফলে শিক্ষা, বাণিজ্য ও শিল্পের অনগ্রসরতা মুসলমানদের ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।"যে পাশ্চাত্য চিন্তায় বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা প্রসারলাভ করতে পারে নি। তাঁরা ঐতিহ্য নির্ভর এবং পশ্চাদ্‌মুখীই রয়ে গেলেন।[৫৩]

তাছাড়া তখন যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব হয় তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। ১৮৮৫ সালে জন্ম নিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। শিক্ষিত শ্রেণি দ্বারা পরিচালিত ছিল এই দলটি। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনের পূর্বে লখনৌর একটি জনসভায় স্যার সৈয়দ আহমেদ খান আসন্ন মাদ্রাজ অধিবেশন প্রসঙ্গে মুসলমানদের কী কর্তব্য সে সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। সভায় উত্তর ভারতের সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও মোগল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় মুসলমানেরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন মুসলমান তালুকদার আইনজীবী, সরকারি আধিকারিক ও সৈন্যদলের পদাধিকারী, লেখক-সাংবাদিক এবং ধর্মীয় মুফতি ও মৌলানাগণ, অল্পসংখ্যক হিন্দু ও রাজপুতেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্যার সৈয়দের মতে ভারতবর্ষ এখনও এক জাতি হয়ে ওঠে নি। হিন্দু ও মুসলমান যেমন এক জাতি নয়, তেমনি মারাঠা ও বাঙালি হিন্দু একজাতি নয়। তিনি কংগ্রেসের বাঙালি আধিপত্যকে ও মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দের এই ভাষণকেই অনেকেই দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান আন্দোলনের অঙ্কুর বলে গণ্য করেন। বিপান চন্দ্র বলেছেন যে, "১৮৮৫ তে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল, তখন থেকেই তিনি (স্যার সৈয়দ) বিরোধিতা শুরু করেন।শুধু তাই নয়, বারানসীর রাজা শিবপ্রসাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিয়ে তিনি কংগ্রেসের পাল্টা আন্দোলন পর্যন্ত শুরু করলেন। তাঁর অনুগামীদের তিনি বোঝাতেন

যে ব্রিটিশ যদি এদেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর আধিপত্য ও অত্যাচার শুরু করবে। যদিও বদরুদ্দিন তায়বজীর মতো মুসলমান নেতারা চেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানে মুসলমানেরা যোগদান করুক, সৈয়দ আহমেদ নিজে এর বিরোধী ছিলেন।"[৫৪]

এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র-স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অতীত ভারতের জয়গান করতে গিয়ে হিন্দু ভারতবর্ষেরই জয়গান করলেন। মধ্যযুগের ভারতবর্ষ বাদ পড়ল। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হল। ঐতিহাসিকেরাও প্রাচীন যুগকে হিন্দু যুগ, এবং মধ্যযুগকে মুসলমান যুগ বলে অভিহিত করলেন। ফলে দুটো ধারা পরস্পর মিলতে পারল না। ব্রিটিশ এই অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বঙ্গভঙ্গ করলেন, যদিও সমগ্র বাংলা এর বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের জন্ম হয় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। জন্মলগ্নে এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতি কোনও বিদ্বেষ পোষণ না করে মুসলমানদের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করা। ১৯০৫-এ 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ' গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য যে সুযোগের সৃষ্টি হয় এর প্রতিদানে লিগ কংগ্রেসের বিরোধিতা করে ব্রিটিশের প্রতি নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সুযোগের সদব্যবহার করাই ছিল মুসলিম লিগের লক্ষ্য। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা' গ্রন্থে বলেছেন যে "উনিশশো পাঁচের বঙ্গভঙ্গ বাঙালি হিন্দুর প্রাণে যতটা দাগা দিয়েছিল, বাঙালি মুসলমানের বোধে তা তেমন করে বাজেনি। হিন্দু জমিদারের কাছে বাঙলা ভাগের পরিণাম ছিল পূর্ববঙ্গে তাদের আধিপত্য চলে যাওয়া, অন্যদিকে মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে বঙ্গভঙ্গ মানে পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রধান একটি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা।" [৫৫] কিন্তু ১৯১১-১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম লিগের মোহভঙ্গ হয়। ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সুবিধা আদায়ের কৌশল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

তুরস্কের সুলতানের হ্লমতা সংকোচনের সুত্র ধরে যে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়, তাকে গান্ধী সমর্থন করেছিলেন। শেষে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলে খিলাফত আন্দোলন তার কার্যকারিতা হারায়। এই আন্দোলনের ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদী মানসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলা যেতে পারে। অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম থেকেই ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব খুব বেশি।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ দুটি রাজনৈতিক দলেরই বিপুল ভূমিকা আছে। কংগ্রেস যদিও প্রথম থেকেই মুসলমানদের জন্য সমঅধিকার রহ্লায় সচেষ্ট ছিল, কিন্তু মুসলিম লিগ কখনোই এই আশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল না। হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্রে মুসলমানদের স্বার্থ বিপন্ন হবে— এই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।" যেভাবেই হোক, মুসলমান নেতাদের মনে হয়েছিল, তাঁরা মনশ্চহ্লে এক জোরদার ও হিন্দুপ্রবণ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখতে পাচ্ছেন, যাকে মানা যায় না। ফলে দেশ যখন স্বাধীনতার মুখোমুখি তখন মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের পরিকল্পনাটি মুসলিম লিগ ও লিগ সমর্থক বহু সংখ্যক মুসলমান প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন।"[৫৬]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বেশিরভাগ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। মুসলিম লিগ বাংলা ও পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারতসরকার আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে মহম্মদ আলি জিন্না প্রচার করতে থাকেন যে, ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু নন, তাঁরা একটি স্বতন্ত্র জাতি । তিনি প্রচার করেন যে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি। এঁদের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ২৪ মার্চ মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহকে পৃথক করে স্বায়ত্তশাসিত, স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যে পরিণত করার দাবি জানানো

হয়। এই দাবি পরবর্তীকালে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। জিন্নাও বারংবার ঘোষণা করতে থাকেন যে ভারতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হল ভারত বিভাগ।

১৯৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে পরিস্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, ভারতবর্ষে তাদের দিন প্রায় শেষ। যুদ্ধ ও মন্বন্তরে জেরবার ব্রিটিশ প্রশাসন আবার শেষবারের মতো বিভাজনের রেখায় ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করতে উদ্যত হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন গণজাগরণের রূপ নিয়েছিল, রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছিল শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা; উনিশশো ছেচল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে নৌ-বিদ্রোহ, পয়তাল্লিশের নভেম্বরে আর ছেচল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় যুব-উত্থান ইত্যাদি একের পর এক ঘটনায় ব্রিটিশ সরকারের ভিত নড়ে গেছিল। এই অবস্থায় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতীয় রাজনীতির বাস্তব রূপ উপলব্ধি করে ভারতের স্বাধীনতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিন মন্ত্রীর মিশন ভারত পাঠান ১৯৪৬ এর মার্চে। ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা আর বাদ-বিসংবাদের পর ওই প্রতিনিধি দল বা 'ক্যাবিনেট মিশন' হ্ল মতা হস্তান্তরের বিষয়ে একটি রূপরেখা পেশ করলেন ১৬ মে।

মিশনের এই প্রস্তাবে একটি ত্রি-স্তর সংযুক্ত কাঠামোর কথা বলা হয়েছিল। এই কাঠামোয় কেন্দ্রের হ্ল মতা তুলনায় কম; তার অধীনে থাকবে কেবল বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরহ্লা আর যোগাযোগ বিভাগ।

প্রদেশগুলি সম্পর্কে বলা হয়: ১৯৩৫ এর আইন অনুসারে প্রদেশগুলিতে ইতিমধ্যেই যে প্রাদেশিক আইন পরিষদ গঠন করা হয়েছে, সেগুলিকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে গ্রুপ 'এ', পাঞ্জাবসহ উত্তর পশ্চিমের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি

নিয়ে গ্রুপ 'বি' আর বাংলার উত্তর-পূর্বের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলি নিয়ে গ্রুপ 'সি'। গ্রুপগুলির নিজেদের আইন প্রণয়নের হ্লমতা থাকবে, কোন্ কোন্ বিষয় যৌথ দায়িত্বে রাখা যায়, তা নির্ধারণের অধিকারও তাদের দেওয়া হবে। এই তিন গ্রুপের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন হবে কেন্দ্রীয় সংবিধান সভা। নতুন সংবিধান রচনার পর কোনো একটি প্রদেশ ইচ্ছে করলে যে গ্রুপে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। নতুন সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর প্রাদেশিক বিধানসভা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

'ক্যাবিনেট মিশন'-এর প্রস্তাবের একাধিক অংশ নিয়েই কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে মতভেদ ঘটতে থাকে। ১৬ মে-র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আপত্তি হল বাধ্যতামূলক গ্রুপভাগের প্রশ্নে। গান্ধীর পরিস্কার বক্তব্য ছিল, কোনো প্রদেশেকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো গ্রুপে যোগ দিতে বাধ্য করা চলবে না। ২৪ মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে এই বক্তব্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করা হয় এই ভাবে যে, প্রদেশগুলি কে কোন গ্রুপে যাবে তা ঠিক করার অধিকার তাকেই দিতে হবে: "Provinces shall make their choice whether or not to belong to the section in which they are placed."[৫৭] আরও বলা হয়, সংবিধান রচনার এবং তাকে কার্যকরী করার পূর্ণ অধিকার দিতে হবে সংবিধান সভাকে। এছাড়া গ্রুপকে তার অধীনস্থ প্রদেশগুলির সংবিধান রচনার দায়িত্ব দিয়ে প্রদেশের স্বাধিকারে হস্তহ্লেপ করা হচ্ছে বলে কংগ্রেস অভিযোগ করে এবং এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম লিগও পাকিস্তান দাবি স্বীকার না করে এবং মুসলিমদের প্রতি চরম অবজ্ঞা করা হয়েছে বলে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটকে সমর্থণ করে এক ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালিত হয় বাংলায়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের প্রায় লহ্লাধিক মানুষ যোগ দেয় এতে। চন্দন কুমার কুণ্ডু তাঁর "ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ:

বাংলা উপন্যাসের দর্পণে" গ্রন্থে জানিয়েছেন "৩১ জুলাই অমৃতবাজার পত্রিকা দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এটিকে 'বৃহত্তম সাধারণ ধর্মঘট' বলে উল্লেখ করেন।"[৫৮] সাম্প্রদায়িক ভেদসীমা অতিক্রম করে দলমত নির্বিশেষে বহু সাধারণ মানুষ এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। তাই অনেকেই এই ধর্মঘটকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভূতপূর্ব প্রকাশ রূপেও দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ ঠিক সেই দিনই বোম্বেতে সারা ভারত মুসলিম লিগ কাউন্সিলের সভায় ঘোষিত হয় প্রত্যহ্ল সংগ্রাম বা 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'(Direct Action) এর আহ্বান। সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রত্যহ্ল সংগ্রামের ঘোষণার খবরটির মধ্যে এক অশুভ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রত্যহ্ল সংগ্রামের কারণ হিসাবে লিগ কংগ্রেসের একরোখামি এবং ব্রিটিশের বেইমানিকে দায়ি করেছিল। বলা হয়েছিল মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং 'স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র' অর্জনের জন্যই প্রত্যহ্ল সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে। মুসলিম লিগ আসন্ন সংগ্রামের জন্য মুসলমানদের তৈরি থাকতেও বলেছে। "শুধু এটুকুই প্রত্যহ্ল সংগ্রামের ঘোষণা ছিল না; জিন্নার বিবৃতিতে স্পষ্ট হুমকিও ছিল: Today we have also forged a pistol and are in position to use.[৫৯]

এরপরেই পুরোপুরিভাবে আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বাংলায় লিগ সভাপতি নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন; আর দেরি নয়, সময় হয়ে গেছে: 'The time for the test has come', কলকাতায় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড গঠন করা হয় এবং প্রত্যেকটি জেলায় এর প্রশিহ্লণ শিবিরও খোলা হয়ে যায়। বাংলার লিগ প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দী মুসলমান যুবসমাজকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রস্তুত হতে বলেন।[৬০]

১৯৪৬ এর ১৬ আগষ্ট মুসলিম লিগ 'প্রত্যহ্ল সংগ্রাম' এবং ধর্মঘটের ডাক দেয়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা লিগের এই কর্মসূচির বিরোধিতা করে। মুসলিম লিগ এই দিনটি উদ্‌যাপন করে হত্যা, লুঠ, আগুন লাগানো প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। কয়েকদিন যে নারকীয়

উন্মত্ততা কলকাতার ইতিহাসকে কলংকিত করেছিল তা 'The Great Calcutta killing' নামে পরিচিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলায় এর আগে হয় নি এমন নয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের ঘোষিত কর্মসূচি পালনকে উপলহ্ল করে এবং ছুটি ঘোষণা করে এমন দাঙ্গার কর্মসূচি ভারতবর্ষে এই প্রথম। 'ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ: বাংলা উপন্যাসের দর্পণে' গ্রন্থে চন্দন কুমার কুণ্ডু জানিয়েছেন, "সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এভাবে, হিন্দুরা দোকানপাট খোলা রাখলে লিগ সমর্থকেরা জোর করে দোকান বন্ধ করার চেষ্টা করে। ব্রিটিশ লেখক লিওনার্ড মোসলে এর বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে— ভোরবেলাতেই হাওড়ার একদল গুণ্ডা লাঠি, ছুরি, লোহার রড নিয়ে কলকাতায় চলে আসে এবং যারা দোকান খোলা রেখেছিল তাদের মারধোর করে ছুরি মারে।" [৬১] এভাবে প্রথম দিকে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাধ্যমে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। মারধোর, ছুরিকাঘাত প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি প্রথম দিকে উত্তর কলকাতাতেই ঘটে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। নৃশংসতম এই ভ্রাতৃঘাতী মারণযজ্ঞ চলেছিল চার দিন ধরে। তারপরেও দাঙ্গার আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকে। চারদিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপহ্লে পাঁচ হাজার (মতান্তরে দশ হাজার) নর-নারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়। আহত হয় পনেরো হাজার এর মত মানুষ। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায় অথবা লুঠ হয়। নারীর অমর্যাদারও বহু ঘটনা ঘটে।

এই খবর পূর্ববাংলায় পৌঁছোলে নোয়াখালির হিন্দুদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চলে। আবার তার প্রতিক্রিয়ায় বিহারের হিন্দুরা বিহারি মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালায়। এ ব্যাপারে আবুল মনসুর আহমদ 'আমার রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থে লিখেছেন— "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে বাংলা বিহার এক যুদ্ধহ্লেত্রে পরিণত হয়, এই যুদ্ধ চলে প্রায় চারমাস ধরিয়া। উভয়পহ্লে কত লোক যে হতাহত ও কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে ধ্বংস হইয়াছিল তাহা লেখাজোখা নাই। .... এই দাঙ্গার পরে ইংরেজ, হিন্দু-মুসলিম তিনপহ্লই বুঝিতে পারে, দেশ

বিভাগ ছাড়া সত্যিই আর কোন উপায়ান্তর নাই।" [৬২]

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও দাঙ্গার আগুন লেলিহান হয়ে ওঠে। 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ: ভগ্ননীড়ের বেদনা' গ্রন্থে হেনা সিনহা উল্লেখ করেছেন যে মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার জন্য হিন্দু মহাসভা বঙ্গভঙ্গের দাবি করে। হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ বঙ্গবিভাগের বিষয়ে বলতে শুরু করেন যে যদি পাকিস্তান গঠিত নাও হয় তাহলেও বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। বাংলার মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি বঙ্গভঙ্গের দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন এবং এক ঐক্যবদ্ধ, অবিভক্ত ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন। জিন্না ও তাঁর অনুগামীরা স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। জিন্না এক বিবৃতিতে জানান, ঘৃণা ও তিক্ততা থেকেই পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবি উপস্থাপিত হয়েছে। জিন্না পরিষ্কার করেই বলেন, ভারতকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামক দুটো পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে হবে এবং মুসলমানদের নিজস্ব বাসভূমি পাকিস্তানে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান,বাংলাদেশ ও আসামকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"[৬৩]

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসনভার অর্পণ করবেন। এই ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, যদি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে সংবিধান পরিষদ সংবিধান রচনায় ব্যর্থ হয়, তাহলে ব্রিটিশ সরকার নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো রাজনৈতিক দলের হাতে কেন্দ্রের শাসনভার অর্পণ করবে। অবশ্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়াভেলের জায়গায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এলেন বড়লাট হয়ে। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এক মীমাংসাসূত্র উদ্ভাবন করলেন। তিনি ভারতকে বিভক্ত করে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন অর্থাৎ স্বাধীন

ভারতের সঙ্গে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথাও ঘোষণা করেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ ভারত বিভাগের প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত সম্মত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাস করা হল। এই আইনের দ্বারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। ভারত বিভক্ত হল এবং ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রিতে দিল্লিতে গণ-পরিষদের অধিবেশন বসল। এই পরিষদ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্ এর অংশ হিসেবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। যেহেতু বাংলার পূর্বাঞ্চলে মুসলমান জনগণের সংখ্যা বেশি সে কারণে বাংলার পূর্বাঞ্চল পূর্বপাকিস্তান রূপে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল। বিভক্ত হল পাঞ্জাব, বিভক্ত হল বাংলা।

ভারত বিভক্ত হওয়ায় স্বাধীনতার অন্যতম বিষময় ফল হল ব্যাপক হারে প্রব্রজন, স্থানান্তর এবং তার ফলে 'উদ্বাস্তু" সমস্যা। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ নোয়াখালি দাঙ্গার সময় থেকে। বিশেষ করে ওই জেলার রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ থানা পরবর্তীতে ঢাকা,ময়মনসিংহ, জামালপুর, যশোর, খুলনায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্মম নির্যাতন ও আক্রমণ শুরু হয়। তারা পরিবারদের নিয়ে প্রাণ-মান সম্ভ্রম নিয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে এসে প্রথমে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পরে কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে আত্মীয় স্বজনদের বাড়ি বা ভাড়াবাড়িতে বসবাস শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু সমস্যা আরো প্রবল আকার ধারণ করে। ভারত প্রথম থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতে স্থিত মুসলমানদের মনে আস্থা জাগানোর কাজে নিরন্তর সচেতন ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রথম থেকেই ইসলামি রাষ্ট্র রূপে ঘোষিত। পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের প্রাণ ও সম্পত্তি সংরক্ষণের কথা বললেও পরিস্থিতি সেখানে কিছুটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়ালো। পাকিস্তানে 'ইসলামী রাষ্ট্র' ও শরিয়তি শাসনের শ্লোগানে হিন্দুরা মানের ভয়ে

ঘাবড়ে গিয়েছিল। ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে সসম্মানে দেশে বাস করতে পারবে না বুঝে হিন্দুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া দীর্ঘকাল হিন্দুরা যেসব অঞ্চলে সামাজিকভাবে উচ্চবর্গীয়ের সম্মান লাভ করেছেন সেইসব অঞ্চলে একদা যে মুসলমান সামাজিক ভাবে কিছুটা নিচু স্থানে অবস্থান করতেন, তাদের দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকেন। তাদের বসতবাটি ও ভূসম্পত্তি দখল করে নেবার লোভের ফলে সারা পূর্বপাকিস্তানব্যাপী শুরু হয়ে গেল লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, জমি থেকে উৎখাত প্রভৃতি। সুতরাং স্বাধীন ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে মাথা উঁচু করে বাস করবার আশা বুকে নিয়ে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন শিবিরে দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সমীহ্লায় জানা যাচ্ছে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ লহ্ল হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছিলেন।

স্বাধীনতার দু-তিন বছর পর পর্যন্ত যে সব হিন্দু পিতৃপুরুষের দেশত্যাগ না করবার ইচ্ছে নিয়ে পূর্ববঙ্গে থাকবার চেষ্টা করেছিলেন, ১৯৫০ নাগাদ তা আর তাঁরা পারেন নি। সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা, শত্রু সম্পদ-লুণ্ঠন, ধর্ষণ প্রভৃতি চলতেই থাকে। সেই সময় ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্পর্কে জানা যায়—"নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা ছিল অকল্পনীয়। এক সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু আর এক সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুকে আক্রমণ করেছে; নারী লুণ্ঠন হয়েছে নির্বিচারে, কোলে-শিশু জননীও রেহাই পাননি সেই উন্মত্ত পাশবিকতার আক্রমণ থেকে।.. অনেক অশ্রু রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ক্রমশই বিস্বাদ হয়ে যাচ্ছিল মানুষের কাছে। স্বাধীনতা এসেছে, দেশভাগ হয়েছে। অথচ দাঙ্গা রক্তপাতের বিরাম নেই।"[৬৪] এইরকম পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক হিন্দু বাঙালি পূর্বপাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। তাদের এই আসাকে প্রফুল্ল চক্রবর্তী তুলনা করেছেন তুষার-ধস নামার সঙ্গে— This time the migrants come down like an avalanche."[৬৫]

এর ফলে পশ্চিমবাংলার প্রশাসন ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। এই বিপুল সংখ্যক

উদ্বাস্তুর আগমন পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিল এক বিরাট সমস্যারূপে । উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে এক অবাঞ্ছিত বোঝাস্বরূপ বিবেচিত হয়েছিলেন। কারণ জনসংখ্যার আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে খাদ্য ও বাসস্থানের টান পড়ল। কর্ম-নিযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেল প্রবলভাবে। পশ্চিমবাংলার সাধারণ মধ্যবিত্তরা খুবই সংকটে পড়লেন। এদিকে উদ্বাস্তুরা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনোরকমে টিকে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। রেলস্টেশনে,লাইনের ধারে, বনে বাদাড়ে,যে কোনো ফাঁকা জায়গায় তাঁরা কোনোরকমে একটু আশ্রয় নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্রয়ের সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, রোগ ব্যাধি ও নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আকার ধারণ করল। ছিন্নমূল এই মানুষগুলির হারিয়ে গেল অতীত; ভবিষ্যতও হয়ে পড়ল অনিশ্চিত।

পূর্বভারতের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকা কখনোই খুব ইতিবাচক ছিল না। আজ পশ্চিমবঙ্গ সহ অসম ত্রিপুরার বিচিত্র রাজনৈতিক সমস্যার মূলে দেশভাগের ফলশ্রুতি সঞ্জাত প্রব্রজন ও উদ্বাস্তু সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে অবশ্য বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়।

৪

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ভাগচাষিদের দ্বারা সংঘটিত তেভাগা আন্দোলন। তে-ভাগা অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার প্রায় ষাট-লহ্লাধিক ভাগচাষি তাদের উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ আদায় করার জন্য জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল। এই ঐতিহাসিক 'তেভাগা আন্দোলন' প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৬ এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭ এর মার্চ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ কমবেশি ছয় মাস ধান কাটার সময় ধরে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার উনিশটি প্রধান জেলায়।

১৯৩০ এর দশকের সূচনায় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ফলে গ্রাম-বাংলার কৃষি সম্পর্কে যে আমূল পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে তো আরো প্রকট হয়ে ওঠে ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মহমন্বন্তরের পর থেকে। কৃষক ব্যাপকভাবে জমি হারাতে শুরু করে এবং সেই জমি ক্রয় করে বা আত্মসাৎ করে শহুরে উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোকশ্রেণি। কারণ সাধারণত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের জমি ক্রয় করার মতো অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল। এরাই পরিণত হতে থাকে হুদে জমিদার ও জোতদারে। এই "জমিদাররা (বা জোতদার, গাতিদার পত্তনিদার, প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগী) অবিভক্ত বাংলায় কৃষকদের নিকট থেকে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি টাকার খাজনা আদায় করেন। তাঁরা সরকারকে রাজস্ব ও সেস বাবদ দেন প্রায় সাড়ে তিন-কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় ১৩ কোটি টাকা প্রতি বছর জমিদার জোতদাররা আত্মসাৎ করেন। এর মধ্যে খাজনা তুলবার ও জমিদারি চালাবার ব্যয় তিন কোটি টাকার বেশি হবে না। বাকি ১০ কোটি টাকা জমিদারের বিনা মূলধনে নিট মুনাফা। এটা শুধু আইনসঙ্গত ভাবে তারা যা পান সেই অর্থের পরিমাণ। বে-আইনীভাবে, প্রজাদের শোষণ করে, কৃষকদের উপর জুলুম করে যা আদায় করেন - তার পরিমাণ এর থেকে নেহাৎ কম ছিল না।" [৬৬]

সেই সময়কার এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় তৎকালীন বাংলার শতকরা চৌষট্টি ভাগ জমি ছিল দেশের শতকরা চোদ্দোজনের হাতে। দিনাজপুরে জোতদারের হাতে জমির পরিমাণ জেলার মোট জমির চৌষট্টি ভাগের চেয়েও ঢের বেশি ছিল। বহু জোতদারের পাঁচ-ছয় হাজার বিঘা পর্যন্ত জমি ছিল। এক হাজার- দুই হাজার বিঘা জমির মালিক দু চার জন প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল। ভূমিহীন গরিব কৃষকের সংখ্যা শতকরা সত্তর ভাগ ছিল।[৬৭]

এইভাবে জোতদারদের অসহনীয় অত্যাচার ও শোষণের ফলে বাংলায় সৃষ্টি হল একটি নতুন কৃষক সম্প্রদায় ভাগচাষি বা বর্গাদার। একটু একটু করে তারাই হয়ে উঠল গ্রাম বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি। উত্তরবঙ্গের জেলায় তাদের উপর চলে 'আধি প্রথায় শোষণ,

পশ্চিমবঙ্গে চলে সাঁজা, খাড়াবাগ, মকরাবাগা, পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে চলে 'টঙ্ক' ও চট্টগ্রামে চলে 'গুলা' প্রথা। খাজনার প্রথা যাই হোক না কেন, বাংলার ভাগচাষীরা হয় ফসলে, নয়তো নগদে কিংবা নগদ ও ফসল দুরকমেই জোতদারদের ঘরে তাদের উৎপাদনের অর্ধেক কিংবা তারও বেশি তুলে দিয়ে আসতে বাধ্য হত। জোতদাররা বিনাশ্রমে বিনা উদ্যোগে শুধুমাত্র জমির মালিকানার জোরে যুগযুগান্ত ধরে শোষণ করতো বর্গাদারদের অশ্রু-স্বেদ-রক্ত।[৬৮]

এই বর্গা প্রথায় জোতদাররা নগদ বা হাল-বলদ-সার- বীজ ভাগচাষিদের যদি সরবরাহ করে থাকে তবে সে উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি আদায় করে নেয়। সাধারণত একই জমিতে জোতদার দীর্ঘদিন বর্গাদারকে থাকতে দেয় না। একবছরের মেয়াদে মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে ভাগচাষিরা জমিতে চাষাবাদ করে। এক্ষেত্রে তাদের কোনোরূপ অধিকার বা ভূমিস্বত্বই থাকত না, থাকত না কোনো নিরাপত্তা। ফসল কাটার সময় জমির সমস্ত উৎপাদন তুলে দিয়ে আসতে হত জোতদারের খামারে— স্বভাবতই সেখান থেকে নিজের ন্যায্য প্রাপ্য কোনো বর্গাদারই পেত না। সাধারণত জোতদাররা উৎপাদনের জন্য কোনওরূপ ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করত না। হালগরু, সারবীজ এবং হাল চাষ, নিড়ানি, ফসল কাটা,ফসল জোতদারের বাড়িতে বা নির্দিষ্ট জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া, ফসল মাড়ানো, জোতদারের গোলায় ফসল তুলে দেওয়া ইত্যাদি পরিশ্রম ছিল বর্গাদারের। জোতদার যদিও উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক নিত, তবুও কোনো জায়গায় জোতদারের ভাগে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ নিত। এছাড়া জোতদাররা সেলামি এবং বহুরকমের 'আবওয়াব' বা বাজে কর আধিয়ার বা বর্গাদারের কাছ থেকে আদায় করত। এই সব আবওয়াব ছিল "খোলানি (জোতদারের যে জায়গায় ফসল মজুত হত ও মাড়াই হত তার ভাড়া), বরকন্দাজি (আধিয়ারকে ডাকাডাকি করার জন্য নিযুক্ত লোকের বেতন), ঝাড়ুদারি (খোলান পরিস্কার রাখার জন্য লোকের মজুরি), পাহারাদারি (ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য লোকের বেতন), ওজনি(ফসল ওজনকারীর পারিশ্রমিক) ইত্যাদি। সেলামি(নগদ

টাকায়) এবং আবওয়ারগুলি আধিয়ারের অংশের ফসল থেকে আদায় হত।" [৬৯]

শোষণের এখানেই শেষ নয়। আরও ছিল, "জোতদাররা শুধু জোতদারি করত না। তাদের মহাজনিও ছিল; তারা আধিয়ারকে ধান কর্জা দিত এবং আধিয়ারকেও নিতে হত। কারণ আধি করে যে ধান আধিয়ার পেত তাতে তার বৎসরের তিনমাসও চলত না। কর্জা ধানের সুদ ছিল 'দুনা' অর্থাৎ এক মণে দুই মণ। কোনো কোনো জোতদার ধান কর্জা না দিয়ে আধিয়ারের কাছে চলতি বাজার দরের চেয়ে দুই গুণ দামে বিক্রি করে দিত। সেই টাকা বাকি থাকত এবং নতুন ধান উঠলে সেই টাকার নতুন ধান জোতদারকে দিতে হত। নতুন ধান উঠার সময় ধানের দর সাধারণত খুব কম থাকে। এতে জোতদারেরা সুদে ধান কর্জা দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি লাভবান হত।

এরূপ শোষণের পরেও বর্গাদারদের রেহাই ছিল না। তাকে জোতদারের বাড়িতে সময় অসময়ে বেগার খাটতে হত। কোনরূপ অবাধ্যতা দেখালে তার ওপর চলত অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতন।"[৭০]

১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যুক্তবাংলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে। তাদের উৎপন্ন ফসলের দাম অর্ধেকের নিচে নেমে আসায় জমিদারের খাজনা ও মহাজনের ঋণ শোধ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষকের জমি হস্তান্তরিত হয়ে মুষ্টিমেয় ধনী জোতদার-মহাজনের হাতে চলে যায়। জমির মালিকানা পূর্বপেক্ষা অধিক কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। মাঝারি চাষিরা দ্রুত ক্ষুদ্র চাষি ও ছোট চাষিরা নিঃস্ব ভূমিহীনে পরিণত হতে থাকে। ১৯২১- ১৯৩১ এই দশ বছরে ভূমিহীন মজুরের সংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ৪৯ ভাগ। এই অবস্থায় কৃষকের সামনে সংগ্রাম ছাড়া আর অন্য কোনো পথ খোলা রইল না। স্থানে স্থানে কৃষক অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু কৃষকদের নিজস্ব কোনো সংগঠন না থাকায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কিছু মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে

‘প্রজা সমিতি’ গঠন করা হয়। এই নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন সংগঠিত হয় উত্তরবঙ্গে বগুড়া শহরে। এই সম্মেলন থেকেই ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’ গঠন করা হয়। ‘বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল’ এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে গঠিত হয়। এই দলের কৃষহ্লনগর সম্মেলন সিদ্ধান্ত করেছিল যে কৃষকদের জন্য ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র কৃষক সমিতি গঠন করতে হবে; তারপরেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন জেলায় জেলায় কৃষক সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা। অবশ্য ১৯৩৭ সাল থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানীয় দাবিতে কৃষক সমাজ আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক কৃষক আন্দোলনগুলি ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চার বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলে। এরপর কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার উপর ব্রিটিশ দমননীতি বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের জোয়ার ও তার জন্য দমন পীড়ন এবং ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন ও বিশেষ করে ১৯৪৩ এর মহামন্বন্তর কৃষক আন্দোলনে ভাঁটা এনে দেয়। তবে একথা বলা যায় যে ১৯৩৭-৪০ সাল পর্যন্ত কৃষক সভার নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনগুলি বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ইস্যুতে হলেও সে গুলি ১৯৪৬ এর তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা করার হ্লেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

১৯৪৬ সালে ধান কাটা শুরু হয় গ্রামাঞ্চলে। দেশে তখন সোহরাবর্দি মন্ত্রিসভা এবং তিনিই মুখ্যমন্ত্রী। মুসলিম লিগ দল তখন শাসন হ্লমতায় অধিষ্ঠিত। ওই সময় তেভাগা আন্দোলনের প্রচার ও সমাবেশ শুরু হয়।তেভাগা কৃষকের প্রাণের দাবি। তেভাগার শে-াগান ছিল— “জান দিব তবু ধান দিব না, ‘নিজ খোলানে ধান তোলো’। এর সঙ্গে ‘ব্রিটিশরাজ নিপাত যাক’—এই শে-াগানও যুক্ত হয়েছিল। ‘আধি নাই তেভাগা চাই’, ‘দল বেঁধে ধান কাটো।’ ‘ভলন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোল।’ প্রতিটি সভা ও সমাবেশে হাজার হাজার কৃষক জমায়েত হতে থাকে। সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য এক অভূতপর্ব উন্মাদনা দেখা দেয়। এর মূল কারণ

ছিল চাষিদের মনে জোতদারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ । কারণ তারাই চাষের সম্পূর্ণ খরচ বহন করে অথচ উৎপন্ন ধান যা পায় তা দেনা-শোধ করে কিছুই পায় না। ফলে ডালি-কুলা নিয়ে হালের বলদ লিখে দিয়ে পরের বছরের আবাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

দিনমজুর কৃষকরা এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। কৃষকরা সর্বদাই সশস্ত্র তির ধনুক লাঠি ইত্যাদি হাতে নিয়ে জমায়েতে সামিল হত এবং ভাগচাষিদের সাহস যোগাত। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম স্তরে নিজ খোলানে ধান তোলার আন্দোলন শুরু হয়। জোতদারের খোলানে ধান উঠলে বর্গাদার ন্যায্য ভাগ বা তে-ভাগা পাবে না বলে তারা নিজ খোলানে ধান তুলতে আরম্ভ করে। দীর্ঘদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে জোতদারের খোলানে ধান তোলার বিরুদ্ধে ব্যাপক জাগরণ দেখা দেয়। সর্বত্র হাট-বাজারে মিছিল শুরু হয়। আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে এবং গ্রামের মেয়েরাও আন্দোলনে অংশ নেয়। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে ধানকাটা ও ধান বর্গাদারদের খোলানে তোলা আরম্ভ হয়। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে। জোতদাররা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দমননীতির সাহায্য নিতে থাকে। তারাও দলবদ্ধ ভাবে আন্দোলন নষ্ট করার জন্য কর্মীদের উপর গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে অত্যাচার করতে শুরু করে। কৃষক ও কৃষকনেতাদের নামে নানান ধরনের কুৎসা প্রচার করে। কিন্তু আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

জোতদারের প্রচুর ধান জমি থেকে সরাসরি বর্গাদারের খোলানে তোলা হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে শেষে জোতদারের খোলানে তোলা ধানের গোলা ভেঙে বর্গাদাররা নিজ খোলানে ধান তুলতে শুরু করে, "ভেউ, তরঙ্গপুর, বড়াইল এলাকায় জোতদারের খোলানের ধান বর্গাদারের খোলানে আনার জন্য প্রচুর গরুর গাড়ি ও স্বেচ্ছাসেবক সংঘটিত হয়। বীর যোদ্ধার মতো ওই ধানের বেশিরভাগই বর্গাদারের খোলানে আনতে সমর্থ হয়।" [৭১]

সমস্ত কৃষক সম্মিলিতভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। তাদের মনে দৃঢ়

ধারণা জন্মে যে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাতে পারলে গ্রাম থেকে সামন্ত্রতন্ত্রের শাসন ও শোষণ নির্মূল করা সম্ভব। ওই আন্দোলন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হিসেবে দেখা দেয়। নিরক্ষর ও সহায়সম্বলহীন কৃষকদের উপর ইংরেজ ও তার সৃষ্ট ওই জমিদার-জোতদার শ্রেণির মাত্রাহীন শোষণ চালানোর এই পরিণাম।

জোতদাররাও এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল। অবশ্য এই আন্দোলনের প্রায় প্রথম থেকেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। সশস্ত্র পুলিশ কৃষক ভলন্টিয়ারদের ধান কাটায় বাধা দিতে লাগল। তারা মাঠে নেমে কৃষকদের বাধা দিল না বটে কিন্তু সব এলাকাতেই কৃষক কর্মীদের নামে মিথ্যে ধান চুরির দায়ে হাজার হাজার গ্রেফতারি পরোয়ানা বের করল। পুলিশ গ্রেফতারের জন্য গ্রামে গ্রামে হানা দিতে লাগল আর কর্মীরা গ্রেফতার এড়িয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করে চলল। জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের কাছে জোতদাররা দল বেঁধে ছোটাছুটি করতে লাগল, কৃষকদের মনে আতঙ্ক ও সন্ত্রাস সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা করতে লাগল। ধান কাটা স্থগিত রেখে আপস আলোচনা চালানোর প্রচার সত্ত্বেও বর্গাদাররা সবজায়গাতেই দ্রুত ধান কেটে নিজ নিজ খোলানে তুলতে লাগল। গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ গ্রামে প্রবেশ করলে তারা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করল।

"৪ জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল। দিনাজপুর শহরের কাছে চিরির বন্দর এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ কৃষকদের উপর প্রথম গুলি চালনা করে। গুলিতে কমরেড শিবরাম ও সমিরুদ্দিন নিহত হন। তেভাগা সংগ্রামের প্রথম শহিদ শিবরাম ও সমিরুদ্দিন। সমিরুদ্দিন ছিলেন খেতমজুর আর শিবরাম ছিলেন গরিব সাওঁতাল আধিয়ার। ওই সংঘর্ষে একজন সশস্ত্র পুলিশও তিরবদ্ধ হয়ে মারা যায়। সংগঠিত এলাকার সবখানেই আধিয়াররা ধান কেটে নিজ খোলানে তুলেছে। তাদের গ্রেপ্তার ও কোনও পুলিশি সন্ত্রাস দমন করতে পারে নি, সংকল্পে তারা ছিল অটল।"[৭২]

ধান কাটা প্রায় শেষের পর্যায়ে। তখনও গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র পুলিশের হানা অব্যাহত। কৃষকরাও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের দল গ্রামে প্রবেশ করলেই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কাঁসর ঘন্টা বেজে ওঠে। আর ধ্বনিত হয় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান। কৃষক মেয়েরাই এর সংগঠক। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ি থেকে কৃষক মেয়েরা লাঠি, ঝাঁটা হাতে বাড়ির বাইরে সমবেত হয় এবং পুলিশ বাহিনীর গ্রামে প্রবেশের পথে অবরোধ সৃষ্টি করে। কৃষকনেতা সুশীল সেনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে এই সময় লিগ সরকার তেভাগা সংক্রান্ত একটি বিল আইন সভায় পেশ করতে যাচ্ছিলেন। ওই বিলের খসড়া ২২শে জানুয়ারীর গেজেটও প্রকাশিত হয়। আগুনের মতো এ সংবাদ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সংগ্রাম এবার নতুন মোড় নিল। এই অধ্যায় 'খোলান ভাঙা' আন্দোলন নামে পরিচিত। তেভাগা সম্পর্কে সরকার আইন পাস করেছেন। এই সংবাদে অসংগঠিত এলাকার আধিয়াররা যারা জোতদারের ভয়ে তাদের খোলানে ধান তুলেছিল তারা জোতদারের খোলান ভেঙে নিজ নিজ খোলানে ধান তুলতে আরম্ভ করল। নতুন ওই অঞ্চলগুলির আধিয়ারদের এক বড় অংশ ছিল মুসলমান কৃষক। মুসলিম লিগ এই আন্দোলনকে পণ্ড করার জন্য দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করতে লাগল জোতদারদের চাপে পড়ে। কংগ্রেস তো প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিল। লুঠতরাজ ও ডাকাতির কাল্পনিক অভিযোগ আনা হল সংগ্রামী আধিয়ার কৃষকদের বিরুদ্ধে। জোতদারদের চাপে এবার লিগ সরকার পিছু হটলেন। গেজেটে প্রকাশিত হলেও তেভাগা বিলটি আইনসভায় উপস্থাপিত হল না। এর পরিবর্তে সরকার গ্রহণ করলেন নৃশংস দমন-পীড়নের পথ।

মিলিটারি ও পুলিশ আমদানি হল। যে সমস্ত অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন তীব্র সে সব-এলাকায় পুলিশ ও মিলিটারির ঘাঁটি বসল। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে পুলিশি অভিযান আরম্ভ হল। অনেক কৃষক কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

হল। তাদের ধরার নাম করে বাড়ি বাড়ি পুলিশি হানা চলল। কৃষক কর্মীদের বাড়িতে হানা দিয়ে যখন তাদের খোঁজ পেতনা তখন পুলিশের সামনেই জোতদারের দল বাড়ির লোকদের — মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে লাঠি সোটা দিয়ে অমানুষিক মারধোর করত। বেশির ভাগ হ্লেত্রে পুলিশ নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শক হত। কখনও কখনও পুলিশ এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুঠের ভাগ নিত। গুলি, লাঠি, জেল, আগুন লাগানো, মারপিট, গুণ্ডামি খুন-জখম এইসব চলা সত্ত্বেও কৃষকদের লড়াইকে দমানো গেল না।

একদিকে পুলিশ আর জোতদারেরা নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। আর অন্য দিকে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা সভা করে সুরাবর্দি মন্ত্রিসভার এই দমন নীতিকে সমর্থন করে কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসার অভিযান চালিয়েছিল। "দিনাজপুর জেলাতেও নিশীথ কুণ্ডু নামক আইনসভার সদস্য কংগ্রেস নেতার একই রকম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁরা তেভাগা আন্দোলনকে সরাসরি আইন বিরুদ্ধ ডাকাতি ও লুঠতরাজের পর্যায়ভুক্ত বলে প্রচার করেন। মুসলিম লিগ সরকার বাংলার গ্রামাঞ্চলে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে পারছেনা এবং কৃষক আন্দোলনকারীদের দ্বারা গ্রামবাংলার মধ্যবিত্ত ও হিন্দু জোতদার শ্রেণির অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে এই অভিযোগ তারা উত্থাপন করেন।"[৭৪] কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই বিভিন্ন ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য তেভাগা আন্দোলনকে দায়ি করার চেষ্টা করে। "কিন্তু বাস্তব ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ১৯৪৬ সালের শেষার্ধের বাকি সময়ে ও ১৯৪৭ এর সূচনায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গামুক্ত ছিল তার জন্য তেভাগা আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কৃষকসভা যখন তেভাগার দাবীতে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) তখন তারও লহ্ল্য ছিল সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রতিহত করার জন্য শ্রমজীবী শ্রেণির ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ

এবং এর ফলে দেখা যায় যে তেভাগা অধ্যুষিত অঞ্চলে আন্দোলন চলাকালীন পর্বে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি এবং হিন্দু-মুসলমান ভাগচাষী, হ্লে তমজুর ও কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবেই এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।"[৭৩]

এরই মধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে, ধীরে ধীরে তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এল, বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এই "দেশ বিভাগের বিষাক্ত আবহাওয়াই তেভাগা আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম একটি কারণ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৪] তবুও এই আন্দোলনের সাময়িক বিফলতা সত্ত্বেও ছিল বংলা তথা ভারতের কৃষক সংগ্রামের এক নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে ঔপনিবেশিক ভারতে আর কোনো কৃষক অভ্যুত্থান এত প্রখর শ্রেণি সচেতনতা ও রাজনৈতিক দীপ্তিসঞ্জাত ছিল না। তবে দুর্ভাগ্যতম দিক এই যে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের সমন্বয় সাধন শেষ পর্যন্ত করা যায় নি। এর পেছনে ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের শ্রেণিস্বার্থ। কারণ এই জোতদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ছিল এই দুই পার্টির সমর্থক। তাই সঠিকভাবেই বলা হয়েছে। "স্বাধীনতা- লাভের প্রাক-মহূর্তে দেশের অন্যতম সংগ্রামী শক্তি কৃষক সমাজের পৃষ্ঠে জাতীয় নেতৃত্ব যেভাবে ছুরিকাঘাত করেছেন তার তুলনা বিশ্ব ইতিহাসের কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামের অধ্যায়েই খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।..... তবে একথা নিদ্বির্ধায় বলা চলে যে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত শ্রেণির সঙ্গে বুর্জোয়াদের বা মুৎসুদ্দিদের আপোস রফার ফলে সৃষ্ট রাজশক্তি ও প্রতিপত্তিবান পরজীবী সামাজিক শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রামে মোকাবিলা করার শক্তি যে ভারতীয় কৃষকরা অর্জন করতে পেরেছেন তার প্রমাণ ছিল তেভাগা সংগ্রাম।" [৭৫]

৫

ঘটনাবহুল চল্লিশের দশকের এই প্রধান ঘটনাগুলি বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিকে ঊর্মিমুখর করে তুলেছিল। বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাতেই এই ঘটনাগুলি নানাভাবে ছায়া ফেলেছে।

'বিশেষত বিবরণ ধর্মী উপন্যাসের প্রতিবেদনে এই ছায়া সবচেয়ে প্রলম্বিত। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের উদেশ্য বাংলা উপন্যাসে চল্লিশের দশকের ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার অনুসরণ। এই লক্ষ্যেই সন্দর্ভের প্রবেশক অধ্যায়ে ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের একটি সামান্য প্রতিবেদন উপস্থাপিত হল।

উল্লেখপঞ্জি ঃ-

(১) চন্দ্র বিপান, অমলেশ ত্রিপাঠী, বরুণ দে ঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম, দিল্লী, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুদিত, ২০০৭, পৃ. ৪৬।

(২) ঐ, পৃ. ৪৭।

(৩) ঐ, পৃ. ৪৮।

(৪) ঐ, পৃ. ৫৯।

(৫) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Bipan Chandra : India's struggle for Independence, Penguin Books, 1988, p. 96-97.

(৬) ঐ, পৃ. ৬৪।

(৭) রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, লোকহিত, কলকাতা ২০১১, পৃ. ৯১১।

(৮) ঐ, ছোটো ও বড়ো, পৃ. ৯২১।

(৯) চন্দ্র বিপান ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

(১০) রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', পৃ. ১০১৯।

(১১) ঐ, স্বরাজসাধন, পৃ. ১০০৫।

(১২) ঐ, স্বরাজসাধন, পৃ. ১০০৫।

(১৩) ঐ, সত্যের আহ্বান, পৃ. ৯৫০।

(১৪) চন্দ্র বিপান ঃ স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

(১৫) ঐ, পৃ. ৮০।

(১৬) ঐ, পৃ. ৮১।

(১৭) ঐ, পৃ. ৮৬।

(১৮) ঐ, পৃ. ৯৭।

(১৯) ঐ, পৃ. ৯৭।

(২০) রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রাগুক্ত, সত্যের আহ্বান, পৃ. ৯৪৮।

(২১) ঐ, পৃ. ৯৫০।

(২২) চন্দ্র বিপান, স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

(২৩) ঐ, পৃ. ১১৪।

(২৪) দ্রষ্টব্য, বিপান চন্দ্র ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

(২৫) ঐ, পৃ. ১২৫।

(২৬) ঐ, পৃ. ১৪০।

(২৭) ঐ, পৃ. ১৫০।

(২৮) ঐ, পৃ. ১৬০।

(২৯) ঐ, পৃ. ১৬১।

(৩০) ঐ, পৃ. ১৬৩।

(৩১) Tomar J.K.: History of Modern India, New Delhi 2007, p. 189.

(৩২) ibid, p.18.

(৩৩) Chandra Bipan : India's struggle for Independence, Delhi 1988, p. 461.

(৩৪) ibid, p. 462.

(৩৫) Thomar, J. K., ibid p. 189.

(৩৬) দ্রষ্টব্য, Bipan Chandra : India's struggle for Independence pp. 462-463.

(৩৭) সেনগুপ্ত অমলেন্দু ঃ উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্ব, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৩।

(৩৮) Sarkar Sumit : Modern India, 1885 - 1947, Macmilan p. 406.

(৩৯) ibid, p. 406.

(৪০) Sen Amartya : Poverty & Famines, An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford India, 2007, p. 52.

(৪১) Sarkar Sumit : ibid, p. 406.

(৪২) Sen Amartya : ibid, p. 53.

(৪৩) ibid, p. 58.

(৪৪) পাল শ্রাবণী ঃ কথা সাহিত্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর, কলকাতা ২০০৬, পৃ. ১২।

(৪৫) Sen Amartya : ibid, p. 53.

(৪৬) ibid, p. 63.

(৪৭) পাল শ্রাবণী ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

(৪৮) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Sen Amartya : Poverty and Famine, গ্রন্থটি, পৃ. ৫৩-৫৬।

(৪৯) উদ্ধৃত, পাল শ্রাবণী ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

(৫০) চন্দ্র বিপান ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

(৫১) দ্রষ্টব্য ঃ ঐ, পৃ. ৮৬।

(৫২) সিনহা হেনা ঃ বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও ভগ্ননীড়ের বেদনা, কলকাতা ২০১০, পৃ. ১২।

(৫৩) চন্দ্র বিপান ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

(৫৪) ঐ, পৃ. ৮৮।

(৫৫) বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ ঃ ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২১।

(৫৬) সিনহা হেনা ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

(৫৭) বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

(৫৮) উদ্ধৃত, চন্দন কুমার কুণ্ডু ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশ ভাগ, বাংলা উপন্যাসের দর্পণে, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৩০।

(৫৯) ঐ, পৃ. ৩১।

(৬০) দ্রঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

(৬১) কুণ্ডু চন্দন কুমার ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

(৬২) আহমদ আবুল মনসুর ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৯৩।

(৬৩) সিনহা হেনা ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

(৬৪) ঐ, পৃ. ২৩।

(৬৫) উদ্ধৃত, হেনা সিনহা ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

(৬৬) দাশ সুস্নাত ঃ অবিভন্ন বাঙলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ – রাজনৈতিক প্রেক্ষিত — পর্যালোচনা – পুনর্বিচার, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৮।

(৬৭) তেভাগা আন্দোলন – ধনঞ্জয় রায় সম্পাদিত, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৯১।

(৬৮) দাশ সুস্নাত ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

(৬৯) রায় ধনঞ্জয় ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

(৭০) ঐ, পৃ. ৯২।

(৭১) ঐ, পৃ. ৭১।

(৭২) ঐ, পৃ. ১৫।

(৭৩) ঐ, পৃ. ৯২।

(৭৪) ঐ, পৃ. ৯২।

(৭৫) ঐ, পৃ. ৯২।